বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাজ, ব্যক্তি ও ধর্ম: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

সুজয় মণ্ডল

পিএইচ.ডি (কলা) উপাধির আংশিক সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০২১

কলা সংসদ (দর্শন বিভাগ)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৩২

<u>CERTIFICATE</u>

Certified that the Thesis entitled **বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাজ, ব্যক্তি ও ধর্ম: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Prof. Proyash Sarkar** and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the	Candidate:
Supervisor:	Dated:
Dated:	

স্বীকারোক্তি

প্রথমত, আমি আমার উপদেষ্টা প্রফেসর প্রয়াস সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, আমার পিএইচ.ডি. অধ্যয়ন এবং সম্পর্কিত গবেষণার অবিচ্ছিন্ন সমর্থন, তাঁর ধৈর্য, অনুপ্রেরণা এবং অপরিসীম জ্ঞানের জন্য। তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ আমাকে এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা এবং লেখার ক্ষেত্রে সর্বতভাবে সহায়তা করেছে। আমার পিএইচডি গবেষণার জন্য তাঁর থেকে ভাল পরামর্শদাতা থাকার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

আমার উপদেষ্টা ছাড়াও, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের, দর্শন বিভাগের অন্যান্য প্রফেসরদের আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মন্তব্য এবং উৎসাহের জন্য। এছাড়াও, আমাকে বিভিন্ন বই খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের গ্রন্থাগারিক এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়াও, আমি আমার কর্মস্থল বিশ্বভারতীর দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগের আমার সমস্ত সহকর্মীদের, বিশেষ করে ডঃ কৌশিক ভট্টাচার্য্য, ডঃ মঞ্জরী চক্রবর্তী, ডঃ রঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে আমাকে অনবরত উৎসাহ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। বিশ্বভারতীর প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানের জন্য।

সর্বশেষে আমি আমার পরিবারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই: আমার বাবা এবং মা যাঁরা এই অভিসন্দর্ভ লেখার সময় এবং আমার জীবনের সাধারণভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাকে সমর্থন করে চলেছেন।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ...চ

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ১-১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমাজ..২০-৪৮

সমাজচিন্তার তাত্ত্বিক ইতিহাস ও বঙ্কিমচন্দ্র ২২

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা ২৯

বঙ্কিমের সমাজ ব্যবস্থায় সাম্যতত্ত্ব...৩৫

নারীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কার...৩৮

তৃতীয় অধ্যায়: বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বদেশপ্রীতি: হিন্দু জাতীয়তাবাদ.............................৪৯-৬৭

জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ গঠন.. ৪৯

জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রূপে ধর্ম ৫৩

বঙ্কিমচন্দ্র এবং জাতীয়তাবাদের ধারণা ৫৫

আনন্দমঠ , বন্দেমাতরম ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ....................................৬০

চতুর্থ অধ্যায়: ব্যক্তি-মানুষ.. ৬৮-৮৯

পঞ্চম অধ্যায়: আদর্শ মানুষ ৯০-১১৪

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আদর্শ মানুষের ধারণা.. ৯০

অবতারবাদ ও ঈশ্বরাবতরের সম্ভবনা ৯৬

ঈশ্বরাবতরের প্রয়োজনীয়তা..১০৩

অবতারবাদের দার্শনিক পর্যালোচনা...১০৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: ধর্ম...১১৫-১৪৫

ধর্মের উৎপত্তি..১১৫

ধর্মের লক্ষণ ও স্বরূপ ১১৯

অনুশীলনতত্ত্ব ১৩২

সপ্তম অধ্যায়: নৈতিকতা ১৪৬-১৭৩

বঙ্কিমচন্দ্র ও উপযোগবাদ ১৫৪

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মোক্ষ এবং মোক্ষ লাভের উপায়..১৬৬

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার ১৭৪-১৮১

গ্রন্থপঞ্জি.. ১৮২-১৯১

মুখবন্ধ

“বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাজ, ব্যক্তি ও ধর্ম: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ” শিরোনামের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য হ'ল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক রচনাগুলির মধ্যে যে দার্শনিক ভাবনাচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে তা অধ্যয়ন করা। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা সম্বন্ধে যে পরিমাণে সাহিত্য-সমালোচনা হয়েছে, দর্শন শাস্ত্রে তাঁর দার্শনিক চিন্তা বিষয়ে সেই পরিমাণে দার্শনিক আলোচনা হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজে যে কয়েক জন চিন্তাবিদ্ তাঁদের রচনার মধ্যে দিয়ে সমাজ, ব্যক্তি, ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তা সত্ত্বেও, দর্শন শাস্ত্রে গবেষণা স্তরে অন্যান্য ভারতীয় চিন্তাবিদ্দের দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ নিয়ে যতটা গবেষণা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক তত্ত্বের দার্শনিক আলোচনা সেক্ষেত্রে প্রায় ব্রাত্য থেকে গেছে। এখনও পর্যন্ত দর্শন শাস্ত্রে গবেষণা স্তরে এই ধরণের গবেষণামূলক অধ্যয়ন কখনও চেষ্টা করা হয়নি, হলেও তা অতি নগণ্য এবং সেদিক থেকে বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অভিনবত্ব দাবি করতে পারে

বর্তমান গবেষণাটি ৭ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন শ্রমের ফল। বঙ্কিমচন্দ্র এখনও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সম্ভবত উত্তরসূরীদের ওপর তাঁর প্রভাব কখনও নষ্ট হবে না।

কলকাতা থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কর্মরত থাকার কারণে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের এবং অন্যান্য অ-শিক্ষণ কর্মের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের পরে, এই ধরণের কঠিন ও গুরুতর গবেষণা কাজের জন্য নিজের ব্যক্তিগত অবসর জীবন ত্যাগ করা যায় এবং এই গবেষণার প্রতি ন্যায়বিচার করার জন্য আমি আমার অবসরের প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়েছি। তবে আমার কাছে এটি ছিল ভালবাসার শ্রম।

কলকাতা — সুজয় মণ্ডল

৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীকে অনেক সময় বাংলার ‘নবজাগরণে’র যুগ বলে বর্ণনা করা হয়। এই তথাকথিত নবজাগরণ শুরু হয় মূলত ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। যদিও, ‘বাংলার নবজাগরণ’ বলে প্রকৃতই কিছু হয় কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্বন্ধ। সমাজ, মানব প্রকৃতি, ধর্ম ও নৈতিকতা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে শুধুমাত্র দার্শনিকগণ যে আলোচনা করেন তা নয়; বরং, বিভিন্ন সময়ে বহু সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক তাঁদের রচনাতে উক্ত বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন। তাই, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে অনেক সাহিত্যিক তাঁদের দার্শনিক চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন। এমনই একজন ব্যক্তিত্ব হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে, সে প্রবন্ধ হোক বা উপন্যাস, এক সুসংহত ও সুচিন্তিত দার্শনিক মত প্রকাশ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়কালে যা প্রায়ই বাংলার ‘নবযুগ’ বলে পরিচিত হয়ে এসেছে। বাংলার এই নবযুগের উত্থান ঘটেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির অধীনে, যেটা ছিল ইউরোপীয় নবজাগরণ এবং শিল্পবিপ্লবের ফল, যা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় যুক্তি ও বুদ্ধির শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানকার জনগণের জীবন ও চিন্তাধারায় ব্যাপক বাহ্য ও নৈতিক পরিবর্তন এনেছিল।[১] বাংলায় একপ্রকারের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল যা ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ও হিন্দুধর্মের

[১] Sil, Narasingh P. "Bande Mataram: Bankimchandra Chattopadhyay's nationalistic thought revisted." *South Asia: Journal of South Asian Studies* 25, no. 1 (May 2007): p.123

কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রকৃতির প্রসঙ্গে সংস্কারক ও গোঁড়া ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চলা দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছিল। উপযোগবাদ ও দৃষ্টবাদ (positivism) তৎকালীন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই সংস্কার আন্দোলন সূচিত হয়েছিল মূলত রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা। তিনি ছিলেন মানুষের স্বাধীনতায় দৃঢ় বিশ্বাসী। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল এমন এক সমাজ গঠন করা যেখানে মুক্ত শিক্ষা ও মুক্ত মনের দ্বারা মানব স্বাধীনতা সুরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। স্পষ্টতই, তাঁর উদ্দেশ্যের ভিত্তি ছিল বৌদ্ধিক বৃত্তি। তিনি সেই মুক্ত মানবতা প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেছিলেন যা সমস্ত জাতিগত, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রভেদ অতিক্রম করে উৎকৃষ্টতর ভবিষ্যৎ ও জীবনের মহত্তর ভোগে অবিচলিত বিশ্বাস অর্জনের পক্ষে সহায়ক।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে রামমোহনের প্রভাবে ব্রিটিশ সংসদে সতীদাহ রোধকারী আইন প্রবর্তিত হয়। রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনের ফলস্বরূপ এই আইনের বিরোধিতা করে হিন্দু রক্ষণশীল দলগুলি ধর্মসভা স্থাপন করে যাতে ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ এবং তদ্দ্বারা সনাতন ধর্ম রক্ষার প্রচেষ্টা সফল হয়।[২] ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে রাজা রামমোহন রায় ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সংঘাতকে আধুনিকতাবাদের দুটি ভিন্ন ধারণার মধ্যেকার বিতর্কের নিদর্শনরূপে বোঝা যেতে পারে। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মতে, আধুনিকীকরণ করা উচিত ধর্মশাস্ত্রের এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হিন্দুধর্মের পক্ষে প্রতিকূল হবে। হিন্দু জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় এমন হিতকর জ্ঞানই একমাত্র পাশ্চাত্য থেকে আমদানিযোগ্য। বাস্তবিকই, হিন্দু

---

[২] Sil, Narasingh P. "Bande Mataram: Bankimchandra Chattopadhyay's nationalistic thought revisited." South Asia: Journal of South Asian Studies 25, no. 1 (May 2007): p.124

রক্ষণশীল গোষ্ঠী রামমোহনের যুক্তিবাদী মনোভাব এবং হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১) সমালোচনামূলক কর্মপ্রণালীর কারণে তাদের হিন্দু ঐতিহ্য সম্বন্ধে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেছিলেন। 'নব্যবঙ্গ' আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ডিরোজিও প্রায়ই তাঁর চিন্তাভাবনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রগতিবাদী হিসাবে গণ্য হতেন এবং তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে যুক্তিপূর্ণভাবে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করতেন। ব্যক্তি সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণার প্রতি তাঁর বিরোধমূলক মনোভাব ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর বহু ছাত্রকে সমাজ সংস্কারে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রামমোহন ও ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মগণ অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় যুক্তিবাদী ও প্রয়োগবাদী (pragmatist)-দের সাথে যুক্ত হন এবং হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের জন্য বা নবজাগরণের জন্য শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন শুরু করেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের পক্ষে সংগ্রাম করার ফলে ও প্রায়ই হিন্দু শাস্ত্রগুলির সমালোচনা করার ফলে সমাজে তাঁর অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়ে। তিনি জোরের সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে, "বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন এখন আর বিতর্কের বিষয়বস্তু নয়"।[৩] ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থায় বিদ্যালাভ সত্ত্বেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশের বৌদ্ধিক (বা বুদ্ধিবাদী) পরিমণ্ডল, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ব্যতীত কোনও বিশেষ সাফল্য লাভে সমর্থ হবে না। তাঁর মতে, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ ইত্যাদির বিপ্লব সাধনের ক্ষেত্রে অবশ্যই দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্লবসাধন যুক্তিগতভাবে অগ্রবর্তী হওয়া উচিত। অন্যদিকে, ডিরোজিওপন্থিগণ ডিরোজিওর মুক্ত চিন্তার আদর্শ জাগরণে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু উভয়পক্ষই দীর্ঘস্থায়ী সংস্কার সাধনে

---

[৩] Halder, M. K. *Renaissance and Reaction in Nineteenth Century Bengal.* Calcutta: Minerva Press, 1977. p.38

অসফল হয়। ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন বিষয়ক বিতর্কের ফলে ব্রাহ্মরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় – একদিকে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল (radical) ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্যদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজ। এই বিভাজনের পর ব্রাহ্মসমাজ তাদের আদি প্রকল্প অর্থাৎ সমাজকে যুক্তিবাদী করে তোলার প্রচেষ্টা, যা রামমোহনের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল, সেটা থেকে বিচ্যুত হয়। অপরদিকে, ডিরোজিওপন্থিগনও তাদের চরম রোমান্টিকতা বা কল্পনাবিলাস ও আবেগপ্রবণতার কারণে ব্যর্থ হন। সমাজ সংস্কারক গোষ্ঠীগুলি ও হিন্দু রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের আগমন ঘটেনি। দৃশ্যকল্পে তাঁর আবির্ভাব ঘটে উনবিংশ শতকের ছয়ের দশকের শেষ দিকে।

বঙ্গদর্শন পত্রিকাতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় তাঁর দার্শনিক ভাবধারা পরিস্ফুট হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যে দর্শনের ছোঁয়া থাকলেও তাঁর মূল দার্শনিক রচনাগুলি হল 'হিন্দুধর্ম', *ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য* ইত্যাদি। এই রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমের সম্পূর্ণ দর্শন চিন্তার একটি আভাস পাওয়া যায়। এছাড়াও তাঁর রচিত *আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ* প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যেও তাঁর দর্শন চিন্তার বীজ নিহিত আছে। 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধ ও *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মের দর্শন (philosophy of religion) এবং নৈতিকতা (morality) সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রত্যেক বাঙালী তাঁকে সাহিত্য সম্রাট বলে জানে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় আমরা তাঁর গভীর দার্শনিক সত্তার পরিচয় পাই। প্রত্যেক শিল্পী তাঁর শিল্পের মাধ্যমে নিজস্ব এক জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই জগৎ বস্তুবাদীদের 'জগৎ' কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু,

শিল্পীর সৃষ্ট জগতের যে গভীর তাৎপর্য আছে তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করে না। বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে একটা জগৎ সৃষ্টি করেছেন– যে জগতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর জগতকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। তবে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ে যতটা বিদগ্ধ চিন্তাভাবনা হয়েছে তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনা গুলি অনেকাংশেই উপেক্ষিত থেকে গেছে।

আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্তি, সমাজ ও তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক এবং ধর্ম সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে তার মূল্যায়ন করা। উক্ত বিষয়ে তাঁর বিদগ্ধ চিন্তাভাবনা মিল, বেন্থাম, কোঁৎ, রুশো, স্পেনসার প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারকের চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক ভাবধারাকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ব্যক্তির মতবাদ তাঁকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তা একান্তভাবে গবেষণার দাবি রাখে। *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে অনুশীলনতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ মানুষের কথা বলেছেন[৪], *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থে সেই আদর্শ মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন।[৫] তাঁর এই আদর্শ মানুষের ধারণা ও

[৪] "...যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্ব্বগুণযুক্ত, সর্ব্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।"
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৫৯১

[৫] "...আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য , আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা

অনুশীলনতত্ত্ব তাঁর সমগ্র দার্শনিক চিন্তার ভিত্তিমূল বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই, তাঁর দার্শনিক ভাবধারার সবিচার আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা মানুষ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্ম ছাড়া যেমন সমাজ গঠিত হতে পারে না, তেমনি সমাজ ভিন্ন ধর্মেরও কোনও অস্তিত্ব নেই। ধর্মহীন সমাজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই, সমাজ বিষয়ে বঙ্কিমের চিন্তাভাবনা এই গবেষণার অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে তিনি একটা সামাজিক নকশার কথা বলেছেন। যে সামাজিক নকশা সমাজের রীতিনীতি, অনুজ্ঞা ও নিষেধ গুলিকে নির্ধারণ করবে। কারণ তিনি মনে করেন ব্যক্তির মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটা সামাজিক নকশা একান্ত আবশ্যক। যেহেতু বঙ্কিমের মতে মানুষের সার্বিক উন্নতি ও ধর্ম পালন সমাজ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, সেহেতু আমরা প্রথমেই তাঁর সমাজচিন্তা নিয়ে আলোচনা করব। এই গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল বঙ্কিমের সমাজচিন্তা। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক রচনার মধ্যে সমাজচিন্তার বীজ লক্ষ করা যায়। তবে, তাঁর সমাজচিন্তা বিষয়ক আলোচনা মূলত তাঁর বিভিন্ন সামাজিক রচনা, যেমন—*কৃষ্ণকান্তের উইল*, *বিষবৃক্ষ* ইত্যাদি এবং *সাম্য*, 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিড়াল' ইত্যাদি প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি—ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।"

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৪০৭

যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর পাশ্চাত্যের বহু চিন্তাবিদের প্রভাব ছিল, তাই আমরা প্রথমে সমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা করব এবং এটা বিচার করার চেষ্টা করব যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা উক্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল যে সমস্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হল—বঙ্কিমের মতে সমাজ কী? সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক কীরূপ? সাম্যতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমের বক্তব্য কী? বঙ্কিমের মতে সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সকলের সমান উন্নতি হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সেই সময়ে সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং অপরাপর অধিকারের দাবী স্পষ্ট করে ওঠেনি। বঙ্কিমের সমাজচিন্তার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতির আলোচনা। তাই, নারীর সামাজিক অধিকার, নারী-স্বাধীনতা, নারীশিক্ষা ইত্যাদিও উক্ত অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা স্বদেশ প্রীতি তথা জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার আলোচনা না করি। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল বঙ্কিমকল্পিত স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদ। *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে প্রীতি বৃত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্বদেশ প্রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনেকেই মনে করেন যে, ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছে বঙ্কিমের হাত ধরে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, জাতীয়তাবাদী ভাবধারা যতটা স্পষ্টভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন, সেই সময়কালে অন্য কেউই ততটা স্পষ্ট করে তা ব্যক্ত করতে পারেনি। বঙ্কিমকল্পিত জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হল 'হিন্দুধর্ম'। কিন্তু তিনি কখনও প্রচলিত অর্থে হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করেননি। স্বভাবতই, কী অর্থে তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে

জাতীয়তাবাদের ভিত্তি করতে চেয়েছিলেন তা গবেষণার বিষয়বস্তু। কী কারণে তিনি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে ধর্মকে গ্রহণ করলেন তাও আলোচনা সাপেক্ষ। *আনন্দমঠ* উপন্যাস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল মন্ত্র হিসাবে গৃহীত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দেমাতারম্' গানটি। বন্দেমাতরম্ গানটি যেহেতু দেবভাষায় রচিত এবং তাতে অনেক হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ আছে, সেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক সমালোচনা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে উগ্রহিন্দুত্ববাদী, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই সমস্ত অভিযোগের বিশ্লেষণ করব এবং দেখার চেষ্টা করব যে এই সমস্ত আপত্তি আদৌ তাঁর বিরুদ্ধে উথাপন করা যায় কিনা?

ব্যক্তি অতিরিক্ত সমাজের পৃথক কোনও সত্ত্বা আছে কিনা এ বিষয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। কিন্তু একটা বিষয়ে সমস্ত চিন্তাবিদই প্রায় একমত যে, সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে মূল উপাদান হল ব্যক্তি। তাই সমাজ বিষয়ক যে কোনও আলোচনা ব্যক্তির আলোচনা ভিন্ন অসম্পূর্ণ। অনুরূপভাবে বঙ্কিমের সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রেও ব্যক্তি বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও কোনও স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, ব্যক্তির উন্নতির আগে সমাজের উন্নতি হওয়া আবশ্যক। তবুও তিনি কখনও ব্যক্তির উন্নতিকে খাটো করে দেখেননি। ব্যক্তি বা মানুষের স্বরূপ কী সে বিষয়ে নানা দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও সমাজবিদ নানা সময়ে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ব্যক্তি ও সমাজের স্বরূপ কীভাবে ও কীরূপে প্রস্ফুটিত এবং প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা বা বিচারের জন্য তাঁর পূর্বসূরীদের বক্তব্যের উল্লেখ ও বিচার আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি চিন্তা ও সমাজ চিন্তা কী তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক ও সমাজবিদগণের ভাবনাচিন্তার বিরোধী, নাকি তাঁদের

চিন্তাভাবনার সাথে বঙ্কিমের চিন্তার কোনও সাদৃশ্য আছে–তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। এগুলিই এই গবেষণা সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও সামাজিক তত্ত্ব পাওয়া যায়–তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মতবাদ বা তত্ত্ব হল– গণতান্ত্রিক মতবাদ (democratic theory), উপযোগবাদ (utilitarianism), মার্ক্সবাদ (Marxism), প্রকৃতিবাদ (naturalism), অস্তিবাদ (existentialism) ইত্যাদি। এই তত্ত্বগুলি আলোচনাপূর্বক বঙ্কিমের ব্যক্তিচিন্তা বিষয়ক আলোচনা এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

ব্যক্তি বা মানুষ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনাকে আমরা দুটি দিক থেকে আলোচনা করতে পারি। প্রথম, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে–যেখানে আমরা সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের স্বরূপ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনা তুলে ধরব এবং দ্বিতীয়ত, আদর্শ মানুষের স্বরূপ বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা আলোচনা করব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়–ঐতিহাসিক উপন্যাস, যেমন-*দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, মৃণালিনী* ইত্যাদি, সামাজিক এবং তাত্ত্বিক উপন্যাস। *দেবীচৌধুরাণী* উপন্যাসকে তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবেই উল্লেখ করা উচিত। কারণ, এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের প্রয়োগের দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–*বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, কপালকুণ্ডলা* ইত্যাদি। মূলত এই রচনা গুলির ওপর ভিত্তি করে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ব্যক্তির সামাজিক দিকটি আলোচনা করা হবে।

অনুশীলনতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র এক আদর্শ মানবের চরিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন। এই গবেষণা সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল "আদর্শ মানুষ"। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের মূল বিষয় হল কীভাবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া যায়। তাঁর মতে অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী তখনই হতে পারবে যখন তাঁর সামনে কোনও আদর্শ পুরুষ থাকবে। *ধর্ম্মতত্ত্বে* তিনি বলেছেন একথা সত্যি যে মনুষ্যের মধ্যে এমন আদর্শ মানুষ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তিনি হিন্দুশাস্ত্র থেকে একাধিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। আদর্শ মানবের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি কখনও রামের কথা বলেছেন আবার কখনও কৃষ্ণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, কৃষ্ণ হলেন আদর্শ মানুষ যাঁকে সামনে রেখে বৃত্তি গুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন সম্ভব। এই কারণে, তিনি *কৃষ্ণচরিত্র*-এ কৃষ্ণের চরিত্র রচনায় যত্নবান হয়েছেন। কিন্তু, যা আদর্শ তা প্রায়শই বাস্তব হয় না। অথচ তিনি কৃষ্ণকে একটি বাস্তব এবং ঐতিহাসিক চরিত্র রূপে উল্লেখ করেছেন। এখানে মনে হয় তাঁর বক্তব্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এমনকি তিনি *দেবীচৌধুরানী* উপন্যাসে ভবানী পাঠকের দ্বারা প্রফুল্লের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে এই অনুশীলনতত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। এটা সম্পূর্ণ গবেষণার বিষয় যে তিনি সত্যিই সেই কাজে কতটা সাফল্য লাভ করেছেন।

এই অধ্যায়ের তাই মূল আলোচ্য বিষয় হল—বঙ্কিমের মতে 'আদর্শ মানুষ' বলতে কী বোঝায়। আদর্শ মানুষের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কৃষ্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে কৃষ্ণই হলেন প্রকৃত আদর্শবান পুরুষ। এই অধ্যায়ের আলোচনা মূলত তাঁর *কৃষ্ণচরিত্র* এবং *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থ অনুসরণ করে করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করেছেন তবুও *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণকে রক্তমাংসে গড়া মানুষ হিসেবে দেখেছেন।

কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি এটাই দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে আদর্শ মানুষের চরিত্র কীরূপ হওয়া উচিত। সেই কাজে তিনি কতটা সফল হয়েছেন তা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। কৃষ্ণের ঈশ্বরাবতারের প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ের আরেকটি আলোচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে আমরা এটা দেখার চেষ্টা করব যে কৃষ্ণ যদি ঈশ্বরের অবতার হন, তাহলে অবতার বিষয়ক যে দার্শনিক সমস্যাগুলি আছে, সেই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দের মত কী।

ভারতীয় ধর্মনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হল ধর্ম। ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। সমাজ ও ব্যক্তি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের আলোচনার পর আমাদের আলোচ্য বিষয় হল 'ধর্ম' সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা কীরূপ ছিল। ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হল ধর্ম। ধর্মের স্বরূপ বিষয়ে অনুসন্ধান প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। মীমাংসা দর্শনে ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে – "চোদনা লক্ষণোর্থঃ ধর্মঃ"।[৬] 'চোদনা' শব্দের অর্থ হল ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। অর্থাৎ যা মানুষকে ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করে তাই ধর্ম। কিন্তু মীমাংসকগণ আরও বলেন যে "চোদনা প্রবর্ত্তকো বেদবিধিরূপ"। অর্থাৎ বেদবিধি অনুযায়ী ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হওয়ায় ধর্মের লক্ষণ। কিন্তু এমন বললে আপত্তি হয় যে, পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মগ্রন্থ আছে ততগুলি পৃথক প্রকৃতি সম্পন্ন ধর্ম মানতে হবে। তাই, মীমাংসা দর্শনে যেভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে ধর্মের সার্বিক ও সামগ্রিক স্বরূপের হানি ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তার মূল কারণ হল 'ধর্ম' শব্দের এই নানার্থকতা। এক স্থলে ধর্ম অর্থে এক অর্থ গ্রহণ করে অন্য স্থলে অন্যার্থ গ্রহণ করার জন্যই যত সমস্যার উৎপত্তি হয়।

---

[৬] *মীমাংসা সূত্র* – ১/১/২

তাঁর মতে, মনুস্মৃতি-র প্রথম অধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোকে 'ধর্ম' শব্দটি এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থের ক্রোড়পত্র 'ক'-এ 'ধর্ম'-এর ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের উল্লেখ করেছেন। প্রথম, ইংরেজ যাকে 'রিলিজিয়ন' বলে, তাকে ভারতে 'ধর্ম' বলা হয়। যেমন- হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি। দ্বিতীয়, পাশ্চাত্যে যাকে 'মর‍্যালিটি' বলা হয় প্রাচ্যে তাকে ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়। যেমন- কোনও কাজ ধর্ম বিরুদ্ধ- একে নীতিও বলা হয়। তৃতীয়, 'ধর্ম' শব্দে ভারচু (virtue) বোঝানো হয়। চতুর্থ, রিলিজিয়ন বা নীতির অনুমোদিত কাজকে ধর্ম বলা হয়, তার বিপরীতকে বলে অধর্ম। পঞ্চম, 'ধর্ম' শব্দে গুণ বোঝায়। যেমন- চৌম্বকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ এবং ষষ্ঠ, 'ধর্ম' শব্দ কখনও কখনও আচার বা ব্যবহার্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন- দেশধর্ম, জাতিধর্ম ইত্যাদি।[৭]

পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিকও ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে সেই সমস্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ধর্মের ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন যাতে ধর্মের সামগ্রিক স্বরূপ ও লক্ষণ বোঝা যায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা যায়। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই চেষ্টা কতটা যথার্থ হয়েছে তা মূল্যায়ন ও বিচারের অপেক্ষা রাখে। কান্টের ধর্ম সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাক্সমূলারকে উল্লেখ করে বলেছেন যে,

---

[৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *ধর্ম্মতত্ত্ব*, 'ক্রোড়পত্র-ক', যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. পৃষ্ঠা–৬৭১

"কান্টের মতে ধর্ম হল নৈতিকতা। তাঁর মতে ধর্ম গঠিত হয় নৈতিক কর্তব্য সমূহের দ্বারা, যেগুলিকে আমরা ঐশ্বরিক আজ্ঞা বলে বিবেচনা করি। এবং, এটা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, কান্টের মতে, ঐশ্বরিক আজ্ঞার ওপর ভিত্তি করেই কর্তব্য সমূহ নৈতিক কর্তব্য হয়ে ওঠে; অন্যদিকে তিনি আমাদের বলেন যে, যেহেতু আমরা কর্তব্য সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে সচেতন হই তাই সেগুলিকে আমরা ঐশ্বরিক আজ্ঞা বলে মনে করি।"[৮]

অর্থাৎ কান্টের মতে ধর্ম হল নৈতিকতা বা মর‍্যালিটি। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন ধর্মের এরূপ অর্থ তার সম্পূর্ণতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কারণ, তাঁর মতে, ধর্ম বা রিলিজিয়ন মাত্রেই নৈতিকতা বা মর‍্যালিটিকে বোঝায় না। ধর্মের একটি অংশ মাত্র মর‍্যালিটি।

'ধর্ম' শব্দটি যেমন নৈতিকতাকে বোঝায় তেমনি রিলিজিয়নকেও বোঝায়। অনেকে মনে করেন যে, নৈতিকতা হল রিলিজিয়নের একটি ভিত্তি। অর্থাৎ রিলিজিয়নের মধ্যে দিয়েই নৈতিকতা প্রকাশ পায়। তাই, বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম'-এর ধারণাটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধর্ম অর্থে 'নৈতিকতা' ও 'রিলিজিয়ন' বলতে কী বোঝায় এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক কী তা অবশ্য বিচার্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে মিলের ধর্ম বিষয়ে বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

---

[৮] "According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral duties as devine commands, that he thinks constitute religion. And we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a devine command; on the contrary he tells us that, because we are directly conscious of them as duties, therefore we look upon them as devine commands." (অনুবাদ বর্তমান গবেষকের নিজস্ব)

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *ধর্ম্মতত্ত্ব.* 'ক্রোড়পত্র-ক'. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত. *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬৭৪

বঙ্কিমচন্দ্র মিলের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই মিলের ধর্ম বিষয়ে মত বা ব্যাখ্যাকে তিনি অত্যন্ত উচ্চশ্রেণির ব্যাখ্যা বলে বিবেচনা করেছেন। মিলের মতে, "The essence of religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognized as of the highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish objects of desires."[৯] অর্থাৎ রিলিজিয়ন বা ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল এমন যে, তা আমাদের আবেগ ও ইচ্ছাকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এমন এক আদর্শ বস্তুর দিকে পরিচালনা করে যা চরমগুণসম্পন্ন এবং যা সকল স্বার্থপর ইচ্ছার ওপর অবস্থান করে।

অন্যদিকে সিলি ধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা উপরিউক্ত মিলের মতের সদৃশ। বঙ্কিমচন্দ্র সিলির মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, "Religion is what may be described as habitual and permanent admiration."[১০] এর মর্মার্থ হল ধর্ম এবং ওয়ারসিপ বা উপাসনা সাধারণত ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত। তবে ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি অনুভূতি মানুষের ক্ষেত্রেও সম্পৃক্ত হতে পারে।

অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে নানান পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মত প্রচলিত। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন তা নিশ্চয় আলোচনার বিষয়। কারণ, তিনি মনে করেন যে ধর্মের নানার্থকতার জন্য নানা সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু, দেখা যায় যে, তিনি নিজেও তাঁর প্রবন্ধে ধর্ম কথাটিকে একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যদিও তিনি দাবি করেছেন

---

[৯] Robson, John M., Ed., *The Collected Works of John Stuart Mill*, Volume X, "Essay on Ethics, Religion and Society" 1985. P.422

[১০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *ধর্ম্মতত্ত্ব,* 'ক্রোড়পত্র-ক', যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬৭৪

যে, তিনি 'ধর্ম' বলতে মূলত নৈতিকতাকেই বুঝিয়েছেন। তাই ধর্ম বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এই গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

দর্শনের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল তাঁর 'অনুশীলনতত্ত্ব'। অনুশীলনতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে তিনি মানুষের বৃত্তি সমূহকে চার ভাগে ভাগ করেছেন – শারীরিক বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি।[১১] তাঁর মতে এই সমস্ত বৃত্তির যথার্থ অনুশীলন ও পারস্পারিক সামঞ্জস্যই হল প্রকৃত মনুষ্যত্ব–এটাই ধর্ম। যদিও, তিনি চারপ্রকার বৃত্তির যথার্থ অনুশীলন ও পারস্পারিক সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন, তবুও, তিনি ভক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে যখন অপর সকল বৃত্তির অনুশীলন ভক্তির অনুশাসনে ঘটিত হবে তখনই প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্থাৎ স্থায়ী সুখের উৎপত্তি হবে। তিনি মানুষকে এক সার্বিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্কিমের মতে নৈতিকতা হল ধর্মের একাধিক অর্থের মধ্যে অন্যতম একটি অর্থ। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে ধর্মের ধারণা থেকে নৈতিকতার ধারণাকে পৃথক করে আলোচনা করা যায় না। সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হল বঙ্কিমের মতে নৈতিকতা। কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনও ব্যক্তির কোন কাজ করণীয় তা নির্ধারিত হয় নৈতিকতার দ্বারা। বঙ্কিমের নৈতিকতা বিষয়ক চিন্তাভাবনার মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি বলেছেন যে, সেই কাজই নৈতিক যে

---

[১১] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*. ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৯৫

কাজ ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করা হয়, আবার অন্যদিকে তিনি উপযোগিতার নীতিকে নৈতিকতার মানদণ্ড বলেও উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিমের ওপর হিতবাদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁর মতে সেই কাজই করা কর্তব্য যে কাজের ফলে বেশির ভাগ মানুষের মঙ্গল হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক ভাবধারার ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত আপাতদৃষ্ট সমস্যা সমূহ তাঁর 'ধর্ম'-এর ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন বা তিনি যেভাবে ধর্মকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত সমস্যার উৎপত্তি হয়। তিনি যেক্ষেত্রে 'ধর্ম' বলতে 'নৈতিকতা'-কে বুঝিয়েছেন সেক্ষেত্রে তিনি 'উপযোগিতার নীতি'র গুরুত্বের কথাও বলেছেন। অথচ, তিনি জীবনের শেষ বেলায় উপযোগবাদের সমালোচনাও করেছেন। যদিও, 'উপযোগিতার নীতি'-কে কখনও অধর্ম বলে উল্লেখ করেননি। স্বভাবতই এই আপাতদৃষ্ট স্ববিরোধিতা তাঁর 'ধর্ম' বিষয়ে চিন্তাভাবনার ফসল বলে মনে হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, কীভাবে বঙ্কিমচন্দ্র উপযোগবাদকে অস্বীকার করেও উপযোগিতার নীতিকে স্বীকার করলেন? আবার, 'উপযোগিতার নীতি' যদি অধর্ম না হয় এবং এই নীতি অনুযায়ী যদি স্বীকার করা হয় যে, ধর্মের লক্ষ হল সুখ আহরণ করা, তাহলে, বঙ্কিমের ধর্ম-বিষয়ক চিন্তাভাবনা ভারতীয় দর্শনের মোক্ষের ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। তিনি মনে করেন যে, মোক্ষ হল সুখের অবস্থামাত্র। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের একাংশের মতে মোক্ষ হল আনন্দ স্বরূপ এবং তাঁদের মতে সুখ ও আনন্দ ভিন্ন বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে মোক্ষের অবস্থাকে সুখের অবস্থা বলেছেন, তিনি কি 'সুখ' ও 'আনন্দ'-কে অভিন্ন বলে মনে করেন? কারণ, মোক্ষকে যদি সুখের অবস্থা বলা হয়, তাহলে মোক্ষকে অনিত্য বলতে হয়। সুতরাং, এই

অধ্যায়ের মূল আলোচনার বিষয় হল নৈতিকতা বলতে বঙ্কিমচন্দ্র কী বুঝেছেন। তাঁর নৈতিকতার তত্ত্বে হিতবাদের প্রভাব কতখানি ছিল? ইত্যাদি।

ধর্ম ও নৈতিকতার সাথে যুক্ত মোক্ষের ধারণা। বঙ্কিমচন্দ্র মোক্ষ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রেখে গেছেন। ভারতীয় দর্শন আলোচনার ইতিহাসে মোক্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রায় প্রতিটি দর্শন সম্প্রদায়, সে নাস্তিক হোক বা আস্তিক, নিজেদের মতো করে মোক্ষের স্বরূপ ও মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় ধর্মনীতির চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে অন্যতম হল মোক্ষ। প্রায় সমস্ত আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ই মনে করে যে, ধর্ম হল মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়। তবে, মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে কর্মের প্রাধান্য বেশি না জ্ঞানের প্রাধান্য বেশি সে বিষয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কোনও কোনও দার্শনিক সম্প্রদায় বেদের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে কর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার, উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ জ্ঞানকেই মোক্ষ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। *ভগবদ্গীতা*-তে আমরা লক্ষ করি যে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সমুচ্চয়ের কথা বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মের যে সকল শাস্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল *ভগবদ্গীতা*। তিনি নিজেও গীতার উপর একটি ভাষ্য রচনা করেছেন। যদিও, জীবৎকালে তিনি সেটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র তথাকথিত ভারতীয় দার্শনিকদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন বলে মনে হয়। তাঁর উপর বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। তিনি *ভগবদ্গীতা* ও বৈষ্ণব ধর্মের ওপর ভিত্তি করে *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে বলেছেন যে মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সকলের গুরুত্ব আছে। তবে তিনি ভক্তির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কী কারণে

তিনি ভক্তির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সেই কারণ সমূহ কী যথার্থ এই সমস্তই এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। এর ফলে হয়তো আমরা মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়ের যে স্বরূপ সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর *ভগবদ্গীতা*-র প্রভাব যে ছিল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতা*-তে বলা হয়েছে যে, কোনও কর্মের কী ফল তা বিচার না করেই যা কর্তব্য তাই করতে হবে। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে হবে। অর্থাৎ কর্মের প্রতি প্রবৃত্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কর্মের ফলের নিশ্চয়াত্মক বা সম্ভাবনামূলক জ্ঞান কোনটিই বিচার্য নয়। অথচ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, কোনও কাজ করার আগে সেই কাজের ফলাফল বিচার করা প্রয়োজন। স্বভাবতই, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার সাথে *ভগবদ্গীতা*-য় উল্লিখিত নিষ্কাম কর্মের ধারণার কোনও বিরোধ আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে তার সমাধান কোন পথে সম্ভব তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের মাধ্যমে তাঁর 'ধর্ম' বিষয়ক চিন্তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গেই ভারতীয় ধর্মনীতির একটি গুরুতর সমস্যা, অর্থাৎ কর্মের প্রতি প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ কী, সেই প্রসঙ্গও উপস্থিত হয়। আমার গবেষণার লক্ষ্য হল বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম বিষয়ক চিন্তার উক্ত দিকটির বিশ্লেষণ করা। বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক ভাবধারা একটি পূর্ণতাবাদিতত্ত্ব (perfectionism) বলে মনে হয়। তাই, আমার মূল গবেষণার বিষয় হবে তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনা। এমনকি, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ে সমালোচনা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো এক দার্শনিকের দর্শন চিন্তা সামগ্রিক মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। তাই আমার গবেষণার লক্ষ্য

হল বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনের মূল্যায়ন করা এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে সেই সমস্ত বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ

প্রত্যেক শিল্পী তাঁর শিল্পের মাধ্যমে নিজস্ব এক জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই জগৎ বস্তুবাদীদের 'জগৎ' কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু, শিল্পীর সৃষ্ট জগতের যে গভীর তাৎপর্য আছে তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করে না। বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে একটা জগৎ সৃষ্টি করেছেন—যে জগতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর জগতকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে যে দার্শনিক চিন্তা নিহিত আছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুদীপ্ত কবিরাজ লিখেছেন:

> বঙ্কিমের মুখ্য দার্শনিক উদ্বেগ/ভাবনাকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণনা করা যায়। প্রায়শই তাঁর উপন্যাসের ঘটনাবলি আবর্তিত হয়েছে দুটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে, যে দুটি বিষয় কিনা মানুষের (ব্যক্তির) জীবনের ক্ষেত্রে সমানভাবে আবশ্যিক সত্য। সামাজিক জগতের একটা সীমানির্দেশ থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ একটা প্রাথমিক সামাজিক নকশা থাকা দরকার যা কিনা সেই সমাজের অনুমতি/অনুজ্ঞা এবং নিষেধে/প্রতিষেধ গুলিকে নির্ধারণ করবে। একই সঙ্গে, সমাজ সৃষ্ট নিয়মনীতি গুলোর কাজই হল, ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে যে আদিম প্রবৃত্তি গুলো নিহিত আছে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে বা শৃঙ্খলায়িত করে যুক্তিসম্মতভাবে নিরাপদ আকার দান করা, কিন্তু কদাচ তা করতে সমর্থ হয়। যে সামাজিক ও নৈতিক জগতে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জীবনযাপন করে, তা গঠিত হয় এই দুটি পরস্পর বিসদৃশ ও বিরোধী উপাদান দ্বারা—ব্যক্তির ইচ্ছা ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ। বঙ্কিমের বেশিরভাগ কল্পিত আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছে

> এই মুখ্য দ্বন্দ্বের থেকে—নৈতিক শৃঙ্খলার অবশ্যম্ভাবিতা এবং তার উল্লঙ্ঘনের অবশ্যম্ভাবীতা।[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমের চিন্তাভাবনার মূল কয়েকটি বিষয় আছে, সমাজ, মানুষের স্বরূপ, নৈতিকতা এবং ধর্ম। বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনার প্রেরণা ছিল, প্রত্যক্ষভাবে স্বজাতি, স্বদেশ ও স্ব-সমাজ, এবং পরোক্ষভাবে মানুষের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধান। যে ধর্ম মানুষের সত্যকার প্রকৃতি বা চরিত্রগত স্বধর্ম, যা জীবনের সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে সার্থক হতে চায়- যে ধর্ম জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে, পূর্ণ মনুষ্যত্ব-সাধনের উপায়, বঙ্কিম তাকেই গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের জীবনের অর্থ কী? মানুষের জ্ঞানে সত্যের ধারণা সম্ভব কিনা? লোকহিতের আদর্শ কী? 'ধর্ম' কাকে বলে? 'সমাজ' কাকে বলে? সমাজের মুখাপেক্ষীতা ব্যক্তির পক্ষে কতদূর আবশ্যক? ব্যক্তির যে স্বাধীনতা তার সাথে শেষ পর্যন্ত সামাজিক জীবনের আপোস আদৌ সম্ভব কিনা? ব্যক্তি-ধর্ম ও সমাজ-ধর্মের মধ্যে সঙ্গতির উপায় কী? ইত্যাদি বিষয় বঙ্কিমকে ভাবিয়েছিল এবং বঙ্কিমের সমস্ত রচনার মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা লক্ষ করা যায়। ব্যক্তির-বিকাশ ও সমাজের বিকাশের মধ্যে যে চিরকালীন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ লক্ষ করা যায়, তা বঙ্কিমচন্দ্রকেও ভাবিয়েছিল। তবে বঙ্কিম এই বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে সমাজের উন্নতিতেই ব্যক্তির

---

[১] Bankim's central philosophical concern could be described in two ways. Stories of his novels often turn around a conflict between two inevitabilities, two things that are equally necessary truths of human life. A social world required definitions, a kind of basic social map which defined permissions and prohibitions. At the same time, there are the elemental drives of human nature which these social constructs are meant to discipline into reasonably safe forms, but hardly can. The social and moral worlds in which men actually live are made-up of these two dissimilar and contradictory elements— the desires which make men and the controls which make society. Much of Bankim's fictional movement arises from this central conflict—between the inevitability of moral orders and the inevitability of their transgression. (অনুবাদ বর্তমান গবেষকের নিজস্ব)

Kaviraj, Sudipta. *The Unhappy Consciousness.* Delhi: Oxford University Press, 1995. p-2

প্রকৃত উন্নতি। মোহিতলাল মজুমদার বঙ্কিমের সমাজ ও ব্যক্তি-চিন্তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুরূপ মত পোষণ করেছেন, "তিনি প্রথম হইতেই সমাজের মুক্তিকেই ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন"।[২] তবে একথাও ঠিক যে সমাজের বিকাশ বা মুক্তিকে প্রাধান্য দিলেও বঙ্কিম কখনও ব্যক্তির বিকাশ বা মুক্তিকে খাটো করে দেখেননি। তিনি বুঝেছিলেন যে সমাজের বিকাশের মধ্যেই ব্যক্তির যথার্থ বিকাশ অন্তর্নিহিত থাকলেও, সমাজের সামগ্রিক বিকাশ তখনই সম্ভব হবে যখন ব্যক্তির বিকাশ ঘটবে।

নৈতিকতা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়গুলির সার্থকতা নির্ধারিত হয় সমাজ, মানুষ এবং তাদের পারস্পারিক সম্পর্কের নিরিখে। কেননা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নৈতিকতা ও ধর্মের মূল কাজই হল মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করা এবং সমাজের উন্নতি সাধন করা। নৈতিকতা ও ধর্ম উভয় ধারণাই আপেক্ষিক। আপেক্ষিক, কেননা তাদের ধারণাগত অস্তিত্ব ব্যক্তি এবং সমাজের অস্তিত্ব সাপেক্ষ। সমাজ ও মানুষ ব্যতীত নৈতিকতা ও ধর্মের ধারণা শূন্যগর্ভ। সুতরাং মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও সমাজের স্বরূপ অনুধাবন একান্ত প্রয়োজনীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচেষ্টাই ছিল বিভিন্ন উপন্যাস এবং অনুশীলনতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে মানুষের এবং সমাজের স্বরূপ বর্ণনা করা।

সমাজচিন্তার তাত্ত্বিক ইতিহাস ও বঙ্কিমচন্দ্র

সমাজ বিষয়ক আলোচনা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা যেতে পারে—সমাজ-ব্যক্তির সম্পর্কের দিক থেকে, সমাজের গঠনের দিক থেকে এবং সমাজের প্রকৃতি বা স্বরূপের দিক থেকে। সমাজের স্বরূপের দিক থেকে একটি সমাজ চিরাচরিত, আধুনিক অথবা

---

[২] মজুমদার, মোহিতলাল. *বঙ্কিম-বরণ.* হাওড়া: বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬. পৃষ্ঠা-২৯

উত্তর-আধুনিক হতে পারে। চিরাচরিত সমাজের ভিত্তি হল ধর্ম, আচরণের নিয়ম ও মূল্য এবং প্রকৃত কিম্বা কাল্পনিক অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিক সম্পর্ক। চিরাচরিত সমাজের বৈশিষ্ট্য হল যেখানে, জন্মের ভিত্তিতে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়, ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় অতীতের সাথে সম্পর্কিত প্রথা, সামাজিক নিয়ম ও মূল্য ইত্যাদির দ্বারা, যেখানে সামাজিক সংগঠনগুলির ভিত্তি হল ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যেখানে পৌরাণিকতার প্রাধান্য থাকে।[৩] আধুনিক সমাজ, অন্য দিকে, বিজ্ঞান ও বুদ্ধির ওপরে বেশি গুরুত্ব দেয়।

স্টুয়ার্ট হলের (Stuart Hall 1932-2014) মতে, আধুনিক সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা চিরাচরিত সমাজ থেকে তাকে পৃথক করে। আধুনিক সমাজ ধর্মীয় ভিত্তিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিরপেক্ষ বস্তুবাদী সংস্কৃতির ওপর জোর দেয়, শ্রমবিভাজনের পরিবর্তে দক্ষতা, পরিবর্তিত নারী-পুরুষের পারস্পারিক সম্পর্ক দ্বারা নতুন বিভাজন সৃষ্টি করে এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আধুনিক সমাজের জগতের প্রতি বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।[৪] সুতরাং, যেখানে চিরাচরিত সমাজের বৈশিষ্ট্য হল প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, সরলীকৃত শ্রমবিভাজন এবং অগতিশীলতা, সেখানে আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হল যৌক্তিকতা, বুদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান, বৈজ্ঞানিক মনোভাব, পরিবর্তনশীলতা। আবার, উত্তর-আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হল সমালোচনামূলক সচেতনতা (critical consciousness), প্রকৃতি এবং ব্যক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা। উত্তর-আধুনিক সমাজ জাতীয়তাবাদ থেকে বিশ্বায়নের দিকে অগ্রসরের কথা বলে। অর্থনৈতিক উন্নতির পরিবর্তে

[৩] Ahuja, Ram. *Society in India*. New Delhi: Rawat Publication, 2017. p-1
[৪] O'Donnell, Mike. *Sociology*. United Kingdom: Thomas Nelson & Sons, 1997. p-40

সাংস্কৃতিক উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়। আধুনিক সমাজের থেকে উত্তর-আধুনিক সমাজের পার্থক্য এখানেই যে—এক্ষেত্রে ঐক্য, সমতা এবং সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৫]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ আলোচনা করতে পারি। সেক্ষেত্রে মূলত আমরা মার্ক্সবাদী, ক্রিয়াবাদী এবং সামাজিক উদ্যোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করবো। দুরখেইমের ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উপ-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ব্যক্তির পরিবারের চাহিদা, জ্ঞাতিত্বের চাহিদা, অর্থনৈতিক চাহিদা ইত্যাদি প্রাথমিক চাহিদাগুলিকে পূরণ করতে পারে।[৬] অন্যদিকে মার্ক্সের মতে সমাজের ক্রিয়াকলাপ নির্ভর করে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ওপর। ওয়েবার (Max Weber 1864-1920) হলেন সামাজিক উদ্যোগবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে, সমাজ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে না, বরং, ব্যক্তি সমাজ গঠন করে এবং সমাজকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তির অভিজ্ঞতার আকার ও গঠন সমাজের ওপর নির্ভর করে না, ব্যক্তিই তার নিজের সামাজিক অভিজ্ঞতার কারণ।[৭] বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা এঁদের চিন্তাভাবনা থেকে কিছুটা হলেও ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র ওয়েবারের মত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। কেননা তাঁর মতে কেবলমাত্র ব্যক্তিই যে সমাজকে প্রভাবিত করে, অপরদিকে সমাজ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে না তেমনটা নয়। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বরং, কখনও কখনও

---

[৫] Ahuja, Ram. *Society in India.* New Delhi: Rawat Publication, 2017. p-1

[৬] ঐ, p.3

[৭] দ্রষ্টব্য, Weber, M. The Nature of Social Action. In W. Runciman Ed. & E. Matthews Trans., Max Weber: Selections in Translation. Cambridge: Cambridge University Press. 1978. pp. 7-32

তিনি ব্যক্তির থেকে সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার কারণ হল, বঙ্কিমের মতে ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নতি সমাজের সামগ্রিক উন্নতির দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত উদারনীতিবাদের মূল বিষয় ছিল ব্যক্তি-স্বাধীনতা। পরবর্তীকালে এই উদারনীতিবাদ পুঁজিবাদী ধারায় পর্যবসিত হয় এবং তা ঘটে নব্য-উদারনীতিবাদীদের হাত ধরে। পুঁজিবাদী ধারায় সমাজের খোলা বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ স্বাধীন ব্যবসার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এঁরা মনে করতেন যে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'স্বাধীন প্রতিযোগিতা' থাকা আবশ্যক। যদিও ক্লাসিক্যাল উদারনীতিবাদীরা মনে করতেন যে, এই পুঁজিবাদীতন্ত্র সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপযোগী যাবতীয় শর্তসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁদের এই উচ্চাশা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

পুঁজিবাদ কায়েম হওয়ার ফলে সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবর্তে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। ফলত উদারনীতিবাদ পুঁজিবাদের অলঙ্ঘনীয় পরিণাম থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে ব্যর্থ হয়। এরকম একটা অবস্থায় পুঁজিবাদী উদারনীতিবাদের বিরোধিতা করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সংঘটিত হয়। যে আন্দোলনের মূল বক্তব্যই হল 'মুক্ত প্রতিযোগিতা' নয়, বরং সমাজ ব্যক্তির অবাধ বিকাশের জন্য প্রয়োজন 'মুক্ত সহযোগিতার'। সেন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫), লুইস ব্লাঙ্গ (১৮১১-৮২) প্রমুখ চিন্তাবিদ এই আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। তবে, এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কারিগরগণ এটা বুঝেছিলেন যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা কোথায়, কিন্তু তাঁরা এর কোনও বাস্তব সমাধান সূত্র দিতে পারেননি। যদিও তাঁরা

পুঁজিবাদের ব্যর্থতার দিকগুলি নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন তবুও তাঁরা তার সমাধান করতে পারেননি। ফলত তাঁদের চিন্তাভাবনাকে ‘কাল্পনিক সমাজতন্ত্র’ নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সাম্য’, ‘বিড়াল’ ইত্যাদি প্রবন্ধে তাঁর যে সমাজচিন্তা প্রকাশিত হয়েছে তা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে তাঁর সমাজচিন্তাও পুঁজিবাদ বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্র যে পুঁজিবাদের বিরোধী ছিলেন তা ‘বিড়াল’ প্রবন্ধের মার্জারের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, ‘এই পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদেরও কিছু অধিকার আছে’।[৮]

পুঁজিবাদী সমাজ ধারার সমস্যা সমাধানে কাল্পনিক সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার ফলে ১৮৩০-১৮৪০ সালে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলেসের হাত ধরে আবির্ভূত হয় ‘বৈজ্ঞানিক’ সমাজতন্ত্র। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ করা এবং তার সমাধান দেওয়া, যে সমাধান এসেছিল মার্ক্সবাদ নামক দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে। এই তত্ত্বের লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য গঠনের মাধ্যমে তাঁদের মুক্তি নিশ্চিত করা এবং সমস্ত মানব জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করা।

মার্ক্সবাদকে আমরা এইভাবে বুঝতে পারি যে, এটি হল একগুচ্ছ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি যা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রদান করে। এছাড়াও এই মতবাদ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবসমাজের সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ করে এবং ইতিহাসকে পরস্পর বিরোধী শক্তি ও শ্রেণীর দ্বন্দ্ব প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করে। ক্লাসিক্যাল মার্ক্সবাদের বক্তব্য হল সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের বৈপ্লবিক বিনাশের দ্বারা মানবেতিহাস

---

[৮] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. “বিড়াল”. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬১৮

ব্যক্তি স্বাধীনতার লক্ষ্যে ধাবিত হয়েছে। অন্যদিকে নব্য-মার্ক্সবাদ কর্তৃত্বের চেহারা, সমসাময়িক সমাজের বা সভ্যতার নির্ভরতা ও বিকৃতির সূক্ষ্ম দিকগুলির বিশ্লেষণ ও তার সমাধানের ওপর জোর দিয়েছে।

মার্ক্সবাদ মূলত চারটি নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে–দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। কার্ল মার্ক্স জার্মান দার্শনিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) দর্শন থেকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তার সঙ্গে বস্তুবাদকে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। দার্শনিক হেগেলের মতে জগতের সারমর্ম বা উপাদান হল 'ধারণা' (idea) বা 'চেতনা' (consciousness) এবং সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই পরিবর্তনশীল ধারণার অভিব্যক্তি। ধারণার অন্তর্নিহিত চাপা উত্তেজনার জন্য ধারণা সর্বদা নতুন আকারে অভিব্যক্ত হয় — তা ঘটে thesis এবং antithesis-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্য, যার ফল হল synthesis। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত 'পরম ধারণা' বা 'পরম চেতনা'-র অভিব্যক্তি ঘটে। অন্যদিকে মার্ক্স মনে করতেন যে জগতের সারমর্ম হল 'বস্তু'। তিনি হেগেলের এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সঙ্গে প্রকৃতিবাদের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন । তাঁর মতে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি এই বস্তুগত শর্তের অভিব্যক্তি। ফলত, মার্ক্সের এই ধরনের নীতি দ্বান্দ্বিক প্রকৃতিবাদ নামে খ্যাত হয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক প্রকৃতিবাদই মার্ক্সবাদের দার্শনিক ভিত্তি। অপরদিকে ঐতিহাসিক প্রকৃতিবাদ হল মার্ক্সবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। ঐতিহাসিক প্রকৃতিবাদের মূল ধারণাটি হল সমাজে ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক এবং নৈতিক সম্পর্কগুলো অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। মার্ক্সবাদ অনুযায়ী আদর্শ সমাজ বলতে সেই সমাজকে বোঝায় যেখানে সমাজ তাঁর প্রতিটি

সদস্যের পরিতৃপ্তির জন্য তাঁর জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ সমাজস্থ সকল ব্যক্তির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার সমভাবে সমাজের দ্বারা রক্ষিত হওয়া উচিত। তবে মার্ক্স ও এঙ্গেলস উভয়েই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, এরূপ আদর্শ সমাজ একদিনে গড়ে উঠতে পারে না। তাই তাঁদের মতে, এমন আদর্শ সমাজ বহু টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে এবং এই টানাপোড়েনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে কিছু অসম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

মার্ক্সবাদ অনুযায়ী সমাজ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় না, বরং সমাজ গঠিত হয় আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের দ্বারা।[৯] মার্ক্সবাদ অনুযায়ী সমাজকে বুঝতে হবে সমাজের ভিত (base) এবং উপরিকাঠামো (superstructure)-এর দ্বারা। সমাজের 'ভিত' বলতে বোঝায় 'উৎপাদনের ধরণ' (mode of production) এবং 'উপরিকাঠামো' বলতে বোঝায় সমাজের আইনগত ও রাজনৈতিক কাঠামো, ধর্ম, নৈতিকতা, সামাজিক অনুশীলন, সাহিত্য, কলা এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি। মার্ক্সের মতে সমাজের চরিত্র নির্ভর করে এই উৎপাদনের ধরণের ওপর ভিত্তি করে। উৎপাদনের ধরণ যেমন হবে সমাজের চরিত্রও তেমন হবে। যেমন, উৎপাদনের ধরণ যদি বৃহত্তর যন্ত্র নির্ভর হয় তাহলে সেই সমাজ পুঁজিবাদী চরিত্রের হবে।

মার্ক্সবাদে শ্রেণী বৈষম্যের মূল কারণ হিসেবে অর্থনীতিকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা এবং হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য কেবলমাত্র অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। এইবিষয়ে আম্বেদকরের বক্তব্য হল, বৈষম্যের এরূপ

---

[৯] "Society does not consist of individuals, but expresses the sum of interrelations, the relations within which these individuals stand."
Karl Marx, Martin Nicolaus. *Grundrisse: Foundation of the Critique of Political Philosophy*. Penguin Classics, Reprint 1993. p.265

ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। কেন না, তাঁর মতে, হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নির্ধারিত হয় তার সামাজিক অবস্থানের অর্থাৎ জাতের ওপর ভিত্তি করে, যেখানে পাশ্চাত্য সমাজের ক্ষমতার প্রধান উৎস হল অর্থনৈতিক।[১০] অর্থনৈতিক বৈষম্যের গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও, বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে 'বর্ণবৈষম্য' যে অধিকতর ভয়াবহ ও গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তীকালে ডঃ আম্বেদকরও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে জাতপাত হিন্দু সমাজের কোনও উন্নতি করেনি, বরং জাতপাত হিন্দুদের অসংলগ্ন করেছে এবং মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে।[১১] বঙ্কিমচন্দ্রও তদ্রূপ মত পোষণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও আম্বেদকর উভয়েই মনে করেন যে হিন্দুসমাজে (যদিও আম্বেদকরের মতে 'হিন্দুসমাজ' বলে প্রকৃত কিছু হয় না[১২]) মানুষে মানুষে বৈষম্যের কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক ভেদের তুলনায় বর্ণ-ব্যবস্থা ভূমিকা অনেক বেশি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা

প্রশ্ন হল সমাজ কাকে বলে? বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত জীবনদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব জুড়ে রয়েছে এই সমাজ চিন্তা। তাঁর মতে, সমাজ অর্থে একটা বিশেষ স্থান ও কালগত সংস্কৃতি বা জাতিসংস্কারসম্পন্ন জনসংহতিকে বোঝায় এবং মানুষের আত্ম-বিকাশের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত যে একত্র জীবন তারই আধার হল এই সমাজ। অর্থাৎ সমাজ

---

[১০] দ্রষ্টব্য *Ambedkar, Dr. B. R. Annihilation of Caste.* Amritsar: The Ambedkar School of Thought, 1936.

[১১] দ্রষ্টব্য, ঐ

[১২] The first and foremost thing that must be recognized is that Hindu Society is a myth".
ঐ, p.25

বলতে একটা জাতি ও দেশের সীমাযুক্ত জনমণ্ডলীই বোঝায়। এরকম প্রত্যেকটি সমাজের স্বতন্ত্রভাবে আত্মবিকাশের অধিকারকে স্বীকার করলে, স্বকীয় ও পরকীয় অধিকার মেনে নিলে, মানুষের জীবনের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনধর্মে জগৎ-প্রীতি ও স্বজাতি-প্রীতির ক্ষেত্রে করেছেন। দুরখেইম-এর মতে সমাজ বলতে কেবলমাত্র কোনও জনগোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাস করাকে বোঝায় না, বরং সমাজ বলতে বিভিন্ন মানুষের ধারণা, বিশ্বাস, আবেগ ইত্যাদির সমষ্টিকে বোঝায়, সমাজ হল সেই সত্তা যা উৎপন্ন হয় বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিবেকের মেলবন্ধনের দ্বারা।[১৩] কিন্তু সমাজের এরূপ ধারণার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সমাজের থেকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সমাজকে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক ও বিবেকের ফল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলত, এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির প্রাধান্যতাই মুখ্য বিষয়, এখানে সমাজ গৌণ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কখনও সমাজকে গৌণ এবং ব্যক্তিকে মুখ্য বলবেন না। কারণ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিকাশের কেবলমাত্র সমষ্টিকে বোঝায় না। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণই মানবজাতির কল্যাণের যথার্থ উপায়, আর সেই সমাজকে শুধুমাত্র ব্যক্তি-সমষ্টি হিসাবে দেখলে চলবে না। সমাজের অস্তিত্ব শুধুমাত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিবেকের ওপর নির্ভরশীল নয়। সমাজের অস্তিত্ব ব্যক্তির চিন্তা ও বিশ্বাসের অতিরিক্তভাবে আছে বলেই বঙ্কিম মনে করতেন। তাই বঙ্কিমের নিকট সমাজের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক বিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

---

[১৩] দ্রষ্টব্য, Durkheim, E. *The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and Its Method*. Translated by W. D. Halls, Steven Lukes, ed. New York: The Free Press, 1982.

বঙ্কিমচন্দ্র এক আদর্শ সমাজের কল্পনা করেছিলেন। যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ এই দুইয়ের কল্যাণ একই, ব্যক্তির কোনও স্বতন্ত্র স্বার্থ বা অধিকার নেই। ফলত অধিকার-সাম্যের প্রশ্নও নেই। পরস্পরের সমান অধিকার না থাকলেও বঙ্কিম প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকারের কথা বলেছেন। সেই অধিকার হল মানুষ হওয়ার অধিকার, অর্থাৎ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের অধিকার। সমাজই হল মনুষ্যত্বের ভিত্তি, আর সকল মানুষ সমান—একথার অর্থ হল সেই মনুষ্যত্ব আয়ত্তের সামর্থ্য সকল মানুষেরই আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাজকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে উপস্থিত যাবতীয় গুণাবলি সমাজের মধ্যেও আছে। সমাজই হল ব্যক্তির শিক্ষক, রক্ষাকর্তা ও নিয়ম প্রণেতা। এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, "সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজের আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ড প্রণেতা, ভরণ-পোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক"।[১৪] বঙ্কিমের ক্ষেত্রে স্বদেশ ও সমাজ একই বস্তু। তবে আধুনিককালের বিশ্বমানবতাবাদ বা আন্তর্জাতিকতায় বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন না। তিনি জাতীয়তাবাদের ওপরেই আন্তর্জাতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন কখনও কখনও স্বদেশ প্রীতিই বড় ধর্ম। এই ক্ষেত্রে মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়,

> ...পূর্ব্বে বলিয়াছি, আধুনিক কালে বিশ্বমানব নামে যে একটা ধারণার উদ্ভব হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি এই সমাজ অর্থে 'নেশন' বুঝিতে রাজি

[১৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬১৯

> আছেন, এবং nationalism-এর উপরেই internationalism স্থাপনা করিতে চান। ...মানবের মানবত্ব কোন অর্থে যতই সার্ব্বভৌমিক হউক – ভৌগোলিক প্রকৃতি, ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন এবং রক্তের পার্থক্য, এই তিনের সমবায়ে সমাজে সমাজে পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী ; নির্বিশেষ নয় – বিশেষের অভিমুখেই সৃষ্টির গতি।[১৫]

তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বঙ্কিমের জাতি প্রেম আর আধুনিককালের ন্যাশানালিজম এক নয়। এক নয় এই কারণেই যে, বঙ্কিমের জাতিপ্রেমের মধ্যে কোথাও পরজাতি বিদ্বেষের কথা উল্লেখ নেই। বরং, বহু ক্ষেত্রে বঙ্কিমের মতে আত্মহিতের তুলনায় পরহিত প্রতিষ্ঠা বড় ধর্ম। বঙ্কিমের এই স্বদেশ প্রীতি বা জাতিপ্রেমের প্রতি এই অনুরাগের মূল কারণ হল ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি। তিনি মনে করতেন আত্ম-পরিচয়ের জন্য ইতিহাস-উদ্ধার, এবং আত্ম-মর্যাদাবোধের জন্য স্বকীয় সংস্কৃতির গৌরব-প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। আত্ম-মর্যাদাহীন ব্যক্তির পক্ষে যেমন প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা সম্ভব নয়, তেমনি জাতীয় গৌরব বোধহীন সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব।[১৬]

কিন্তু প্রশ্ন হল এই স্বদেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? বঙ্কিমের মতে স্বদেশ রক্ষা, স্বজন প্রীতি ইত্যাদি ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম। কারণ এই যে, এর মাধ্যমেই জগতের হিত সম্ভব। বিভিন্ন সমাজ যদি একে অপরকে আক্রমণে সময় বিনষ্ট করে তাহলে সমাজ থেকে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং সকল মানুষের হিতের জন্য প্রত্যেকের উচিত স্বদেশ রক্ষা করা। ভগবানের জন্য সংসার-ত্যাগ নয়, মানুষের জন্য আত্ম-ত্যাগ করতে না পারলে চিত্তশুদ্ধি ঘটবে না। বঙ্কিমের নিজের ভাষায়, "ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর

---

[১৫] মজুমদার, মোহিতলাল. বঙ্কিম-বরণ. হাওড়া: বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬. পৃষ্ঠা-৪২

[১৬] ঐ, পৃষ্ঠা-৪২

ধর্ম্ম"।[১৭] বঙ্কিমের এই স্বদেশ প্রীতি কিন্তু তাঁর অনুশীলন ধর্মের একটি সাধন অঙ্গ। এর প্রয়োজন রাষ্ট্রিক নয়, বরং সামাজিক। আশঙ্কা হতে পারে যে, বঙ্কিম বোধহয় পরজাতি বিদ্বেষের কথা বলছেন। তা কিন্তু নয়, স্বদেশ প্রীতির মধ্যে কোনও রকম পরজাতি বিদ্বেষ নেই, এখানে কেবলমাত্র স্বজাতি প্রীতির কথাই বলা হয়েছে। বঙ্কিম আরও বলেছেন যে এই স্বদেশ প্রীতির পরিণতি হল জগৎ-প্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাজ গঠনের আদর্শ রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি নয়, মনুষ্যত্বই হল সমাজের আদর্শ বা ভিত্তি। বঙ্কিমের এই জাতিপ্রেম বা স্বদেশ প্রীতির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, "...দেশপ্রীতির সাধনায় সর্ব্বস্ব পণ কর; ভগবদপ্রীতির নীচেই ঐ প্রীতিকে আসন দাও, নিজ ইষ্টদেবতার রূপে ঐ দেশ-দেবতার উপাসনা কর; উহাতেই ঐহিক ও পারত্রিক দুই পরিত্রাণই লাভ হইবে"।[১৮]

হব্‌স্‌, রুশো প্রমুখ সমাজবিদগণ সমাজের উৎপত্তি, গঠন এবং সমাজ ও ব্যক্তির আন্তর্সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের উৎপত্তি বিষয়ক কোনও আলোচনা করেননি। বরং সমাজের গঠন এবং সমাজের সাথে ব্যক্তি বা মানুষের সম্পর্ক কীরূপ হওয়া উচিত সেই বিষয়ে তিনি বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন। হিন্দুসমাজের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার কয়েকটি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা মূলত হিন্দুসমাজ কেন্দ্রিক। সাম্যের ধারণা, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, জীবনের চরম লক্ষ্য হিসেবে মোক্ষের ধারণা, ব্যক্তির গুণ হিসেবে সহনশীলতা, অহিংসা,

---

[১৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৬১

[১৮] মজুমদার, মোহিতলাল. বঙ্কিম-বরণ. হাওড়া: বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬. পৃষ্ঠা-২০০

ঈশ্বর এবং জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার একাত্মবোধের ধারণার ওপর হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সাম্যের ধারণাটি হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে সমস্যামূলক। হিন্দুধর্ম তথা হিন্দু সমাজ সকল ব্যক্তির মোক্ষ লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দিলেও বর্ণাশ্রমের ধারণা সাম্য তত্ত্বের বিরোধী। হিন্দুসমাজে যে ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিন্যাস আছে তাঁর ভিত্তি হল এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। বর্ণ-ব্যবস্থার উৎপত্তি বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে বংশগত, কর্মগত এবং গুণগত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। *গীতাতে* তথা *মহাভারতে* বর্ণের বিভাগ কর্ম ও গুণ নির্ভর বলা হয়েছে। অর্থাৎ গুণ ও কর্মের নিরিখে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, কেউ আবার শূদ্র হয়। বঙ্কিমচন্দ্রও বর্ণ-ব্যবস্থার এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন এবং তিনি আরও মনে করেন যে, ভারতবর্ষের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ হল এই বর্ণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞানতা। তাঁর নিজের ভাষায়,

> ...যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকুই না বুঝাই ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতে কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।[১৯]

বঙ্কিমের মতে বর্ণাশ্রমধর্ম ও জাতিভেদ সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। তাঁর মতে বর্ণাশ্রমধর্ম সামাজিক কর্মবিভাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার অপব্যবহারে জাতিভেদ কুফলপ্রদ হতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম সামাজিক প্রয়োজনীয়তা থেকেই প্রবর্তিত হয়েছিল এবং তা সমাজের

---

[১৯] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬১৮

পক্ষে মঙ্গলজনক। বর্ণাশ্রমধর্মের শীর্ষ স্থানে আছে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ যদি এই বর্ণাশ্রমধর্মের প্রকৃত অনুবর্তী হয় তবে হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গল হতে পারে। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে সেরূপ হয়েছিল। তখন ব্রাহ্মণ প্রকৃতই সমাজশিক্ষক, সমাজের গুরু, দেবতা, ভক্তির পাত্র ছিল। তখন ব্রাহ্মণ ভক্তিতে সামাজিক কল্যাণই সাধিত হত। কিন্তু প্রশ্ন হল, ব্রহ্মত্বহীন, স্বার্থপর, নীচবৃত্তিপরায়ণ যে ব্রাহ্মণ তাকেও কী ভক্তি করতে হবে? তাঁর মতে, "যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাহাঁকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাহাঁকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাহাঁকে ভক্তি করিব"।[২০]

বর্ণ-ব্যবস্থার এরূপ ব্যাখ্যা বঙ্কিমের পক্ষে অবশ্য স্বীকার্য, কেন না, অনুশীলনতত্ত্বের তথা বঙ্কিমের ধর্মচিন্তার ভিত্তি হল ভক্তি। বঙ্কিম কিন্তু শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির কথা বলেননি। যেই গুণবান সেই ভক্তির পাত্র। আর যেহেতু বঙ্কিমের মতে সমাজের মধ্যে সেই সকল গুণ বর্তমান যা প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষের আছে, সেহেতু সমাজও ভক্তির পাত্র।

বঙ্কিমের সমাজ ব্যবস্থায় সাম্যতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশক্তির চরম উৎকর্ষ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিদগ্ধ চিন্তাভাবনার দ্বারা। 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজদর্শন, রাষ্ট্রদর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। ইংরাজি 'equality' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'সাম্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাম্য বলতে মূলত যা বোঝায় তা হল—'সকল

---

[২০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬১৮

মানুষের সমান অধিকার'। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে সমতা। কী কী বিষয়ে 'সমান অধিকারের' প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। তবে, 'সাম্য' কী তা বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের যে বিষয়টি আলোচনা করতে হবে তা হলো, 'বৈষম্য' বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি এবং ঠিক কী ধরণের বৈষম্য মানুষের সামাজিক অবস্থান ও জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কারণ।

'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই দু'ধরণের বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন—প্রাকৃত বৈষম্য এবং অপ্রাকৃত বৈষম্য। এর মধ্যে অপ্রাকৃত বৈষম্য মানুষের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। মানুষে মানুষে বৈষম্য বা অসাম্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষতার প্রতিবন্ধক। 'প্রাকৃত বৈষম্য', যাকে 'নৈসর্গিক বৈষম্য'ও বলা যায়, বলতে বঙ্কিমচন্দ্র সেইসব বৈষম্যকে বুঝিয়েছেন, যেগুলি উৎসস্থল সমাজ তথা সামাজিক কৃত্রিম মানদণ্ড নয়। অর্থাৎ শারীরিক ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে মানুষে মানুষে যে ভেদ তা এই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। প্রাকৃত বৈষম্য বা ভেদজন্য মানুষের মধ্যে যে অসাম্য তা মানুষের সামাজিক অবস্থান, মূল্য, পারস্পারিক সম্বন্ধের উপরে বিশেষ কু-প্রভাব বিস্তার করে না। সামাজিক অবস্থান, মূল্য, পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অসাম্য পরিলক্ষিত হয় তার মূল কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, অপ্রাকৃত বৈষম্য–যে বৈষম্যের উৎস হল সামাজিক কৃত্রিম মানদণ্ড। অপ্রাকৃত বৈষম্যের নানাবিধ উৎসের কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন।

'সাম্য' প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র অপ্রাকৃত বৈষম্যের বিভিন্ন উৎসের উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা, অধিকৃত সম্পদ বা অর্থ, বর্ণ-ব্যবস্থা ইত্যাদি হল অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান এই সমস্ত বিষয়ের উপরে নির্ভর করে বলে

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন। সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সমাজদার্শনিক, রাষ্ট্রদার্শনিকদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হয় বলে মনে হয়। উল্লিখিত কারণগুলি যে অসাম্যের মূল কারণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এইসমস্ত বিষয়কে হাতিয়ার করে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নিচু প্রমাণিত করে এবং তাদের শোষণ, নিপীড়ন করে। ফলে একদল ব্যক্তি নিজেদের ক্ষমতা কায়েম রেখে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে এবং অন্য আরেকদল মানুষ দীর্ণ থেকে দীর্ণতর হয়ে পড়ে এবং এঁরা হয়ে ওঠে প্রথম শ্রেণীর মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাপনের উপায় মাত্র। এক্ষেত্রে আমরা বঙ্কিমের চিন্তার সাথে মার্ক্সের চিন্তার মিল খুঁজে পাই। মার্ক্সবাদ অনুযায়ী সমাজ পরিচালিত হয় সমাজস্থ শ্রেণী দ্বন্দ্বের দ্বারা। মালিক শ্রেণী সর্বদা সর্বহারা শ্রেণীকে নিপীড়িত করে, শোষণ করে।

সাম্যতত্ত্বের পথপ্রদর্শক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র গৌতম বুদ্ধ, যীশুখ্রিস্ট এবং রুশোর কথা উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণব্যবস্থার বিরোধিতা করে, শূদ্রদের উন্নতিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যীশুখ্রিষ্ট কৃতদাসদের দুর্দশা ও শৃঙ্খলামোচনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভলতেয়ারের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র রুশোর অর্থনৈতিক সাম্যকে অপছন্দ করলেও ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে রুশোর চিন্তায় গতিবেগ সঞ্চার করে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। রুশোকেই তিনি সাম্য ও সমাজবাদের জনক বলে অভিহিত করেছেন। সাম্য সম্পর্কে বঙ্কিমের চিন্তা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে সাম্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসনে তিনি *সাম্য* প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন,

আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে – কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক – কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই, বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের মুক্তির পথ মুক্ত চাহি।[২১]

নারীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কার

বাংলার নবজাগরণের সময় সমাজ ব্যাবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিন্তার মধ্যে একধরনের পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা যায়। তারা মনে করতে শুরু করেন যে, যদি জীবনকে অর্থপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে শুধুমাত্র চিরাচরিত মূল্যের সংরক্ষণের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন চিরাচরিত মূল্য ও নিয়মগুলির গভীর বিশ্লেষণ এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেগুলির সংস্কার করা।

আমরা জানি যে বাংলার সমাজ ব্যাবস্থার ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের পুরোধা হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), যিনি একজন যুক্তিবাদী। তিনি নানাভাবে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে তিনি সমাজের নানবিধ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার প্রধান দৃষ্টান্ত হল সতীদাহ প্রথা রদ। রামমোহনের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি উনিশ শতকে আরও ভিন্ন ভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলন ঘটতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র

[২১] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *সাম্য.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪০৬

বিদ্যাসাগর হলেন এই প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম একজন। তিনি মূলত সমাজের দুটি বিশেষ বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন–বিধবা-বিবাহ এবং বহুবিবাহ। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল নারী জাতির খারাপ অবস্থার প্রতি সমবেদনা। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বুঝতে পারেন যে, যদি তাঁকে উক্ত সমস্যার সমাধানে সাফল্য লাভ করতে হয়, তাহলে তাঁকে রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিতদের সংস্কার বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন বলবৎ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন কোলকাতায় তাঁর শিক্ষার জন্য আসেন, তখন বাংলার সমাজে এই নানাবিধ সমাজ সংস্কার আন্দোলন ঘটছিল। *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত *বিষবৃক্ষ* এবং *কৃষ্ণকান্তের উইল* এই দুটি উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত আলোচনার ছাপ লক্ষ করা যায়। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের উক্ত দুই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দুর্দশাগ্রস্ত নারী জাতির প্রতি বঙ্কিমের সহানুভূতিশীল মনোভাব তাঁর উক্ত দুই উপন্যাসের পরিলক্ষিত হয়। *বিষবৃক্ষ* আমরা দেখতে পাই যে, নগেন্দ্রনাথ বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করেন। কেউ একে ভাবতে পারে যে বঙ্কিম বিধবা-বিবাহের পক্ষে ছিলেন।[২২] কিন্তু অবশেষে দেখা যায় যে, এই বিবাহ নগেন্দ্রনাথের জীবনে দুর্দশা ডেকে আনে। এখান থেকে সংশয়হীনভাবে আমরা বলতে পারি যে, বঙ্কিম প্রকৃতপক্ষে বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। শুধু তাই নয়, কেউ এমনও ভাবতে

---

[২২] Majumdar, Ujjal Kumar, Ed. Bankim Chandra Chattopadhyay: His Contribution to Indian Life and Culture. Kolkata: The Asiatic Society, May, 2000. p.66

পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন এবং তিনি সেই সমস্ত কিছুর বিরোধিতা করতেন যা তাঁর মতে সমাজের বিভেদের কারণ।

কিন্তু বঙ্কিম সম্বন্ধে এমন মনোভাব খুবই অগভীর এবং অসত্য। এটা প্রায় অবিশ্বাস্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তি, যিনি কিনা মিল-এর উপযোগবাদ এবং কোঁতের প্রত্যক্ষবাদী মানবতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনি নারী জাতির এই অসহনীয় দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের প্রতি অমানবিক মনোভাব পোষণ করতেন। নিশ্চিতভাবে বঙ্কিম বিধবা-বিবাহের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ধারণা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বঙ্কিমের আপত্তি ছিল। কেননা, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজ জীবন যেমন শুধুমাত্র শাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না, তেমনি সমাজ জীবন কেবলমাত্র আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও হতে পারে না। কারণ, শাস্ত্র ও আইন উভয়ের মধ্যেই নানান ফাঁক আছে।[২৩] প্রকৃতপক্ষে উক্ত সমাজ সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে বঙ্কিমের সিদ্ধান্তের ভিত্তি আবেগ নয়, বরং বুদ্ধি হল তার ভিত্তি। সাম্য প্রবন্ধের মাধ্যমে বঙ্কিমের এই দিকটি বোঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

> বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে পারি যে, কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল

[২৩] Majumdar, Ujjal Kumar, ed. Bankim Chandra Chattopadhyay: His Contribution to Indian Life and Culture. Kolkata: The Asiatic Society, May, 2000. p.66

বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। ...কিন্তু যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্যই তাহাতে অধিকারিণী।[২৪]

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ব্যক্তির অধিকারের কথা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে প্রত্যেক ব্যাক্তির সমান অধিকার আছে। যদি স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষ বিবাহ করতে পারে, তাহলে একইভাবে পতির মৃত্যুর পর স্ত্রীও বিবাহ করতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এরকম সিদ্ধান্তের ভিত্তি পক্ষপাতহীন যুক্তিবাদের ওপর ন্যস্ত। এবং, সেই কারণেই আধুনিক সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রসারণ সম্বন্ধে তাঁর ভিন্ন মত ছিল।[২৫] এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাহাঁরা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাঁদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাহাঁরা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ সমাজের ভয়। ...কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, ...ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তা বোধ হয়।[২৬]

---

[২৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *সাম্য.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪০১

[২৫] Majumdar, Ujjal Kumar, ed. Bankim Chandra Chattopadhyay: His Contribution to Indian Life and Culture. Kolkata: The Asiatic Society, May, 2000. p.67

[২৬] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *সাম্য.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪০২

উক্ত সমস্যার প্রতি তাঁর এই অনাসক্ত ও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ছায়া আমরা *বিষবৃক্ষ*-তে দেখতে পায়। সূর্য্যমুখী যখন জানতে পারল যে, নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিধবা কুন্দনন্দিনীর সম্পর্ক আছে, তখন সূর্য্যমুখী মানসিক ভাবে ভারাগ্রস্থ হয়ে তার ননদকে চিঠি লিখে জানায় যে, "...বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"[২৭] আপাতভাবে মনে হতে পারে যে, এই বক্তব্যের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেছেন। কোনও কোনও গবেষক মনে করেন যে, এই বক্তব্য লেখকের নিজের নয়। স্বামীর স্নেহ-ভালবাসার থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে ভয় সূর্য্যমুখী পেয়েছিল, এবং সেই কারণে তার যে মানসিক অবসাদ দেখা দিয়েছিল, সেই অবসাদের বশবর্তী হয়ে সুর্য্যমুখী উক্ত কথা বলেছেন। এই বক্তব্য নিতান্তই উপন্যাসের গল্পের স্বাভাবিকতাকে বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।[২৮]

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ১৯ শতকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পাশাপাশি বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। সমাজের এই সমস্যার দিকটি বঙ্কিমের *বিষবৃক্ষ* এবং *দেবী চৌধুরানী* উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। *দেবী চৌধুরানী* উপন্যাসে আমরা দেখি যে, ব্রজেশ্বর তিনবার বিবাহ করেন। ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ উপন্যাসের নায়িকা প্রফুল্লকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে,

---

[২৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *বিষবৃক্ষ.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ১ম খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬০. পৃষ্ঠা-২৭৯

[২৮] Majumdar, Ujjal Kumar, ed. Bankim Chandra Chattopadhyay: His Contribution to Indian Life and Culture. Kolkata: The Asiatic Society, May, 2000. p.68

পরে ব্রজেশ্বর নয়ন ও সাগরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, ব্রজেশ্বর ও তার পরিবার এই বহুবিবাহের ফলে কোনও পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। অন্যদিকে *বিষবৃক্ষে* দেখা যায় যে, বিধবা কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্রনাথ বিবাহ করলে, সুর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবনে কলহ দেখা দেয়। এখান থেকে এটা মনে হয় যে, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের পরোক্ষ নৈতিক আপত্তি আছে। অন্তত 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিম সেইরূপ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সমালোচনা করেছেন। তবে সেই সমালোচনা পদ্ধতিগত বিষয়ে। এই বিষয়ে বঙ্কিমের মনোভাব খুবই স্পষ্ট, তিনি মনে করতেন বহুবিবাহের মত সামাজিক রীতি আইনের মাধ্যমে দূর করা যাবে না। তিনি মনে করতেন যে, এই সামাজিক রীতি আধুনিক সমাজের ধারার আঘাতে অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাবে। সেটা ঘটবে দুটি কারণে, প্রথমত, গণশিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ। আলোচিত সমস্যার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের সামাজিক-বস্তুবাদী ভাবধারা তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে।[২৯]

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি একান্তভাবে ডিরোজিওর র‍্যাডিক্যাল সমাজ চিন্তা ও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠির চিন্তাভাবনা থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে, তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দুরা সমাজ বিন্যাসের মধ্যে চিরাচরিত মূল্যগুলি টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল এবং নারীদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব হল যে, নারী জাতির উদ্দেশ্য হল গৃহস্থ জীবনের মঙ্গল সাধন

[২৯] Majumdar, Ujjal Kumar, ed. Bankim Chandra Chattopadhyay: His Contribution to Indian Life and Culture. Kolkata: The Asiatic Society, May, 2000. p.69

করা। এই কারণে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে সেই সেকালে জনমত গড়ে ওঠেনি। কিন্তু নারী শিক্ষার প্রতি সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থিত বাঙালিদের মধ্যে বিশেষ সচেতনতা ও প্রচেষ্টাও এই সময় লক্ষ করা যায়। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে নারীদের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তির নিজস্বতার' বোধ ধীরে ধীরে উৎপন্ন হতে থাকে। এই ক্ষেত্রে আমরা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষার নীতি স্মরণ করতে পারি। এই বিষয়ে রাজনারায়ণ বসু তাঁর *সেকাল ও একাল* গ্রন্থে লিখেছেন, "সামাজিক সংস্কার বিষয়ে দেখ, - এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা হইতেছে, তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, লোক বিলাত যাইতেছে, বিধবার বিবাহ হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগের বহির্গমণ বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে"।[৩০]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন এই সমাজ 'পরিবর্তনের' পটভূমিতে। সুতরাং, তাঁর চিন্তাভাবনায় এবং সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এই সমাজ 'পরিবর্তনের' সাক্ষাৎ প্রভাব থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। বঙ্কিমের মতে নারী জাতির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য নারীশিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। এখানে আমরা *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে তারাচরণের বক্তব্যকে উল্লেখ করতে পারি, "তোমরা ইট-পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জ্যেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির

---

[৩০] বসু, রাজনারায়ণ. সেকাল ও একাল. কলকাতা, ১৭৯৬ শকাব্দ. পৃষ্ঠা-৩০

কর”।[৩১] এখানেও কিন্তু নারীশিক্ষার সঙ্গে নারীদের গার্হস্থ্য বন্ধন থেকে মুক্তির পরোক্ষ সম্পর্ককে স্বীকার করা হয়েছে।

কিন্তু নারীশিক্ষা ও নারীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব এবং সম্পর্কে সচেতনতার মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সদর্থক ও দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ পায় তাঁর *আনন্দমঠ*, *দেবী চৌধুরাণী* এবং *সীতারাম* উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। এই উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে তিনি আদর্শ নারীত্বের বিষয়টি তুলে ধরার প্রবল চেষ্টা করেছেন। এইরুপ কঠোর সংকল্পের ফল স্বরূপ আমরা পাই শান্তি (*আনন্দমঠ*), প্রফুল্ল (*দেবী চৌধুরাণী*) এবং শ্রী-এর (*সীতারাম*) মতন চরিত্র। শান্তির চরিত্রের আশ্চর্যজনক সাহসিকতা, নির্ভিকতা ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বঙ্কিমের আদর্শ নারী বিষয়ক ভাবনা রূপায়িত হয়। অন্যদিকে, প্রফুল্লের চরিত্রটিও এক আদর্শগত বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক। প্রফুল্লের চরিত্রের ভিত্তি হল বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্বের ধারণা। শ্রী চরিত্রের মাধ্যমে বঙ্কিম নারী জাতির শিক্ষা ও দৃঢ় মানসিক সক্ষমতার সম্পর্ককে প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য উপন্যাসের নানা নারী চরিত্রের মাধ্যমে বঙ্কিমের নারী জাতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভাবধারা প্রকাশিত হয়েছে। তবে উল্লিখিত এই তিনটি নারী চরিত্র বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নারী শিক্ষার থেকেই আসবে নারীদের স্বাধীনতার প্রতি তাদের সচেতনতা। নানা চরিত্রের মাধ্যমে এই ভাবটি বঙ্কিম তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি ‘সাম্য’ প্রবন্ধে লিখেছেন,

---

[৩১] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *বিষবৃক্ষ.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ১ম খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬০. পৃষ্ঠা-২৬৮

লোকে সুশিক্ষিত হইলে – বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে, এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়, বিদেশী শিল্প বা বিদেশী বণিক তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।[৩২]

কিন্তু বঙ্কিমের মধ্যে এই বিষয়ে কিছু দ্বন্দ্বও আমরা দেখতে পায়। বুদ্ধিবাদি ভাবধারা, ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে হিন্দু শাস্ত্রের ঐতিহ্য ও প্রাচীন মূল্যবোধ বিষয়ে বঙ্কিমের মধ্যে একপ্রকার দ্বন্দ্ব ছিল। তাই আমরা দেখি যে, উক্ত চরিত্রগুলির প্রধান গুণগুলি নারী স্বাধীনতা ও নারী জাতির ব্যাক্তিত্বের প্রকাশক হলেও, শেষ পর্যন্ত সাংসারিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও স্বামীর প্রতি ভক্তি উক্ত নারী চরিত্র গুলির বিশেষতাকে ম্লান করে দেয়। তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র যে নারী জাতির স্বাধীনতা ও অধিকার বিষয়ে বিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে বঙ্কিম যে চিন্তা করেছেন তা প্রকাশ পায় *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসের গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরের কথার মধ্যে দিয়ে। ভ্রমর তার স্বামী গোবিন্দলালের প্রতি চিঠিতে লেখে যে,

তুমি মনে জান বোধ হয়, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা – তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির

---

৩২ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *সাম্য.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪০৫-৪০৬

যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।[৩৩]

আমরা জানি যে তৎকালীন সমাজের সংকীর্ণ মনোভাব ও দুর্দশার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নারী জাতির বিকাশের ক্ষেত্রে 'গার্হস্থ্য জীবনে নারীদের মূল্যকে' নারী স্বাধীনতা ও অধিকারের ধারণার থেকে পৃথক করতে পারেননি। প্রায় সমস্ত উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি যে, নারীদের গার্হস্থ্য মূল্যের গুরুত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, নারী জাতির বিকাশের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের একধরনের প্রগ্রেসিভ ধারণা ছিল। এক্ষেত্রে আমরা 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধ থেকে নিম্নোক্ত উক্তিটি উদ্ধৃত করতে পারি,

...যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; কেন না, স্ত্রীজাতি সমাজের অর্ধেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্য ভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য, এ কথা নীতিবিরুদ্ধ।[৩৪]

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমের সমাজ সংস্কারের ধারণাটি একটি সংহত ধারণা। বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি সমস্যাগুলি, যেগুলি নারী জাতির উন্নতির পরিপন্থী, সেগুলিকে বঙ্কিম কখনও পৃথক ভাবে চিন্তা করেননি। বরং এগুলির বিচ্ছিন্ন সমাধানের থেকে বঙ্কিম

[৩৩] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণকান্তের উইল.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ১ম খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬০. পৃষ্ঠা-৫৭২

[৩৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "প্রাচীনা ও নবীনা". যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-২৫০

ভেবেছিলেন সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সামগ্রিক সমাধান অনেক বেশি ফলপ্রসূ। উক্ত সমস্যা সম্পর্কে বঙ্কিমের যতটুকু নঞর্থক চিন্তা দেখা যায়, তাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে যদি আমরা বঙ্কিমের সমাজ বিষয়ক চিন্তার সামগ্রিক রূপের সঙ্গে একত্র করে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখা যাবে যে, বঙ্কিমের সমাজ সংস্কার চিন্তার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বদেশপ্রীতি: হিন্দু জাতীয়তাবাদ

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণার জন্মভূমি বা উৎসস্থল ধরা হয়ে থাকে ঊনবিংশ শতকের বাংলাকে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতকের বাংলার ইতিহাসের পর্যালোচনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে কীভাবে এই জাতীয়তাবাদের ধারণার ভারতীয় সমাজে আগমন ঘটল। ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, যাঁকে জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু পুনর্জাগরণের বা নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য সম্ভারকে বাদ দিয়ে জাতীয়তাবাদের আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব।

জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ গঠন

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে ভারতীয়দের সামনে এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ উন্মোচিত হয়েছিল। এতদিন তারা সংকীর্ণচিত্ত এক সমাজে বাস করত। তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের কোনও চিহ্ন ছিল না। বিস্ময়করভাবে, দেশপ্রেমের প্রথম লক্ষণ হিন্দু রক্ষণশীলতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতে দেশপ্রেমের চেতনা এসেছিল রামমোহনের দ্বারা সূচিত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ইংরেজী শিক্ষিত মানুষদের মাধ্যমে। যাই হোক, প্রাচ্যবাদী ও Anglicist-দের এই বিতর্ক বহুদিন চলেছিল। ইতিমধ্যে মেকলে, যিনি ছিলেন গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন সদস্য (law member), তাঁর বিখ্যাত Educational minutes-এ ইংরেজী শিক্ষার ভাবনাকে সমর্থন করে প্রকাশ করেন। মেকলের এই

Anglicist ভাবনার গ্রহণ ভদ্রসমাজের এক বড়ো অংশের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা উদ্দীপ্ত করেছিল। কেবলমাত্র প্রাচ্যের ধ্যানধারণায় শিক্ষিত হিন্দু বা মুসলিম জাতীয়তাবাদী তখন ছিল না বললেই চলে।

মনে করা হয় যে, অতীত-আর্তি (nostalgia) যুক্ত জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের প্রথম সুনির্দিষ্ট প্রকাশ ডিরোজিওর ভাবনাতেই ধরা পরেছিল। এই দাবির সপক্ষে ডিরোজিওর কবিতা "To India, My Native Land" -এর কথা উল্লেখ করা যায়। তবে ডিরোজিও সর্বান্তঃকরণে একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। ভারতীয়দের দুর্দশার পিছনে তিনি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাবকে হেতু বলে দাবি করেছিলেন, সেটাই জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের মূল তৈরী করেছিল বলে মনে হয়। ডিরোজিওপন্থীদের এই ধারণা সঙ্গে হিন্দু নবজাগরণ বা পুনর্জাগরণের বৈশিষ্ট্যের মিল দেখা যায়। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীদের মতে, ভারতীয়দের দুর্দশার জন্য বিদেশি শাসকগণ দায়ী। 'বিদেশি শাসক' বলতে ব্রিটিশ ও মুসলিম উভয়কেই তারা বোঝাত। এখানে প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা উদ্ধৃত করা যায়, তিনি লিখেছেন, "প্রাচীন হিন্দু অন্তরাত্মা/প্রাণসত্তা (spirit) -এর কর্মোদ্যোগ, যা মুসলিম নিপীড়নের ঝড়ে নিভে গিয়েছিল..., এখন উদীয়মান প্রজন্মের বুকে উদ্দীপ্ত হবে এবং জ্বলে উঠবে, যারা...,বাণিজ্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের উৎস উন্মোচিত করবে"।[১] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত:, হিন্দু নবজাগরণবাদীরা বলতে শুরু করলেন যে মুসলিম শাসনের তুলনায় ব্রিটিশ শাসন উৎকৃষ্টতর এবং মুসলিমরাই একমাত্র 'বিদেশি শাসক' বলে গণ্য হতে লাগল এবং মুসলিমদের কারণেই হিন্দুদের সামাজিক অবক্ষয় ঘটেছে।

---

[১] Chattopadhyay, Goutam, Ed. *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century*. Calcutta: Progressive Publishers, 1956. p.94

জাতীয়তাবাদ কোনও ভারতীয় ব্যাপার নয়। প্রতীচ্যের ইংরেজী শিক্ষার মারফৎ এটি আমদানি হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে ভারতীয়রা উপযোগবাদ এবং ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারার সাথে পরিচিত হয়। এই দুটি ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজে স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা এই দুই ভাবধারা বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে তাঁর জীবনের শেষ দিকে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে উপযোগবাদ সম্পূর্ণ দর্শন রূপে গ্রহণযোগ্য নয়।[২] দার্শনিক মতবাদ হিসাবে উপযোগবাদের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত কর্ম ও নীতি উপযোগিতা উৎপাদনের নিরিখে বিচার করা যাতে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হয়। এই মতবাদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি এই যে, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে প্রাপ্ত 'সর্বজনহিতায়' এই ভারতীয় নৈতিক আদর্শ অবশ্যই ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে উপযোগবাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বা উৎকৃষ্টতর। ব্রিটিশ সরকারের প্রাথমিক আগ্রহের উপর ভিত্তি করে তাঁর আরেক আপত্তি ছিল এই যে, জাতীয় সচেতনতা তৈরীর নিরিখে ভারতীয়দের পক্ষে নিজ সামর্থ্যে ভরসা করাই শ্রেষ্ঠতর যা তাদের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে এবং জনহিতসাধনের কর্তারূপে সরকারের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করবে।[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র ভেবেছিলেন যে, ইউরোপের ন্যায় ভারতের উত্থানও জাতীয়তাবাদের দ্বারাই ঘটবে, কিন্তু একই সাথে তিনি এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক উপাদানগুলির অভাব আছে। সাধারণত, রাজনৈতিক ধারণারূপে জাতীয়তাবাদ একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী জনগণের বৈচিত্র্যের উপর

---

[২] Ray, Dr. Anil Baran. "Bankimchandra: Development of Nationalism and Indian Identity" *Prabudha Bharata*, August 2005. p.418

[৩] ঐ, p.418

জোর দেয়, যারা জাতি, ধর্ম, ভাষা, প্রথা বা আচারানুষ্ঠান, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ। এখানে জাতীয়তাবাদের অন্তত দুটি প্রাথমিক উপাদান লক্ষ করা যায়– বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে ব্যষ্টির অভেদত্ব প্রতিপাদন এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে অপর রাজনৈতিক গোষ্ঠী থেকে পৃথকীকরণ। কিন্তু জাতীয়তাবাদের এই উভয়প্রকার উপাদানই ভারতীয় ইতিহাসে অনুপস্থিত ছিল। এর পিছনে মূল কারণ গুলি হল – প্রথমত, বর্ণ ব্যবস্থার উপস্থিতি যা জনগণের এক বৃহৎ অংশকে অশিক্ষিত, অপরিশীলিত ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের শাসক কে হবেন সে বিষয়ে ভারতীয়দের অধিকাংশের উদাসীনতা।

ভারতে জাতীয়তাবাদ দুটি খাতে প্রবাহিত হয়েছিল – একটি ছিল হিন্দুদের দ্বারা, অপরটি ছিল মুসলিমদের দ্বারা। রক্ষণশীল মুসলিমরা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কিছুটা সমর্থন জানিয়েছিল তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্য, অর্থাৎ, হিন্দুদের সহযোগিতায় একবার ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দিতে পারলে, তাদের পক্ষে ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা সহজ হবে।[৮] তৎকালীন বঙ্গসমাজে এরকম একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, শিক্ষিত মুসলিমরা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিষয়ে আগ্রহী নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে। কিন্তু তাঁরা হিন্দু নবজাগরণ বা পুনর্জাগরণ ও ব্যষ্টির আত্মপ্রকাশ—এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব থেকে কখনও মুক্ত হতে পারেননি। ফলতঃ, সময়ের সাথে সাথে ডিরোজিওপন্থিগণ ভূস্বামীদের সংগঠনের সাথে যুগ্মভাবে কাজ করতে থাকেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন রাধাকান্ত দেবের ন্যায় একজন হিন্দু নবজাগরণবাদী।

---

[8] Halder, M. K. *Renaissance and Reaction in Nineteenth Century Bengal.* Calcutta: Minerva Press, 1977. p.78

জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রূপে ধর্ম

ডিরোজিওপন্থিগণের ব্যর্থতা ও রামমোহন সূচিত প্রকল্প বঙ্কিমচন্দ্রকে ভিন্ন পথে ভাবাতে বাধ্য করেছিল। তিনি জানতেন যে, ইংরেজী শিক্ষার বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক উপাদান, যা জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক মুক্তির ভিত্তিস্বরূপ তা হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণ পুনর্জাগরণ ঘটাতে সমর্থ নয়। সম্ভবত তাঁর মত ছিল এই যে, চরমপন্থী যুক্তিবাদ উগ্র আবেগময়তা ও কল্পনাবিলাস ডেকে আনে, যা ডিরোজিওপন্থিগণের ব্যর্থতার সম্ভাব্য প্রধান হেতু। হিন্দু সমাজের পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত সংঘটিত বিবিধ আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের উত্থানের সেই কালপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগকে মিশ্রিত করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। তাঁর মনে হয়েছিল, ইউরোপ স্বরূপতই রাজনৈতিক প্রকৃতির, কিন্তু ভারত সহজাতভাবেই ধর্মীয় প্রকৃতির। তাঁর আরও মনে হয়েছিল যে, ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবাদ ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলার শ্রেষ্ঠতম উপায় হচ্ছে ধর্ম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক নৈতিকতা যতক্ষণ না রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিস্বরূপ হয়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগ্রাম এককভাবে এ দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হবে না।[৫] তাঁর মতে, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ধর্মচর্চা ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব ও উন্নতি সাধিত হয় না—একমাত্র ধর্মানুরাগই জাতিমাত্রকে প্রভূত বলশালী ও গৌরবান্বিত করতে পারে। এই জন্যই সর্বাগ্রে আমাদিগকে সৎ ও ধার্মিক হইতে হইবে, অন্যথা কোন আন্দোলন সুফল প্রদান করিবে না"।[৬] ঈশ্বরের পূজার বদলে মনুষ্যেত্বর পূজার যে বিধান

---

[৫] Sil, Narasingh P. "Bande Mataram: Bankimchandra Chattopadhyay's nationalistic thought revisted." *South Asia: Journal of South Asian Studies* 25, no. 1 (May 2007). p.130

[৬] ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন. *বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী.* কলকাতা: আনন্দ, ২০১২. পৃষ্ঠা-৭৯৪

অগাস্ট কোঁৎ দিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা গ্রহণ করেছিলেন। কোঁৎ-এর যুক্তি ছিল যে, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের কল্পিত এবং কোনওরূপ অভিজ্ঞতায় ধরা যায় না, তাই বিমূর্ত ঈশ্বরের পূজা করার চেয়ে মনুষ্যত্বের পূজা করা ভাল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বিমূর্ত ঈশ্বর ও মূর্ত মনুষ্যত্বের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। তাঁর যুক্তি ছিল, ঈশ্বর হচ্ছেন সকল মানবের অন্তরতম সারবস্তু। অতএব, একটির পূজা অন্যটির পূজার সমান।[৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, ধর্ম নিহিত থাকে মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলির সার্বিক উন্নতির মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের মধ্যে। এই সার্বিক, সুসমন্বিত বিকাশের প্রধান উপায় হল ভক্তি। তাঁর কথিত অনুশীলন ধর্মের সারবত্তা হল ভগবানের প্রতি ভক্তি। যেহেতু তাঁর মতে ভগবান বিশ্বের সকল জীবের মধ্যে বর্তমান, তাই ভগবানের প্রতি প্রেমের অর্থ নিজের প্রতি এবং নিজের পরিবার, গোষ্ঠী, দেশ ও সর্বশেষে সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রতি প্রেম। সর্বোপরি স্বদেশের প্রতি প্রেমকে তিনি ধর্মের শ্রেষ্ঠতম রূপ বলে গণ্য করেছেন। তাঁর ভাষায়, “যদি তাহাই হইল, যদি সমাজধ্বংসে ধর্ম্মধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়...অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম”।[৮] ধর্মতত্ত্বের শেষদিকে তিনি আরও লিখেছেন, “ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত”।[৯] বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ

[৭] Ray, Dr. Anil Baran. "Bankimchandra: Development of Nationalism and Indian Identity." *Prabudha Bharata*, August 2005. P.420

[8] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬৬০

[9] ঐ, পৃষ্ঠা–৬৭১

সৃষ্টির প্রয়াস করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তার আগে হিন্দুধর্মের পুনর্গঠন, পুনরুজ্জীবন ও শুদ্ধিকরণ দরকার। তাই তিনি লিখেছেন,

> তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম, যেটুকু সারভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে...যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্ব্বোধগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে...সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম।[১০]

তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে ধর্মকেই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিস্বরূপ হতে হত। রমেশচন্দ্র মজুমদার যেমন যুক্তি দিয়েছেন, "সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য ও আধ্যাত্মিক সৌহার্দ্যকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বলে মনে করা হতো যা ভাষা ও দূরত্বের ব্যবধানকে অগ্রাহ্য করেছিল"।[১১]

বঙ্কিমচন্দ্র এবং জাতীয়তাবাদের ধারণা

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ একটি আমদানিকৃত ব্যাপার। জাতীয়তাবাদের ইউরোপীয় ধারণা ও ভারতীয় ধারণার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি তোমাকে যে,

---

[১০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৭৭৮

[১১] মজুমদার, মোহিতলাল. *বঙ্কিম-বরণ.* হাওড়া: বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬. পৃষ্ঠা–৪২২

দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় patriotism নহে। ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব"।[১২] তাঁর জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের ধারণার ভিত্তি হল প্রেমের আদর্শ যা দ্বারা সবার মঙ্গল সাধিত হয়। তিনি আরো লিখেছেন, "আপনার সমাজের যখন সাধ্যানুসারে ইষ্ট সাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্ট সাধন করিব। পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না"।[১৩] *ভারত-কলঙ্ক*-এ তিনি লিখেছেন,

> হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতি মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতি অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাই করিব।[১৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল পরস্পরবিরোধী মন্তব্য অন্য এক বির্তকের জন্ম দিয়েছে যে, তিনি মানবতাবাদী ছিলেন কি না। নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর মতে, বঙ্কিমের হাত ধরেই বাংলায়

---

[১২] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬৬১

[১৩] ঐ, পৃষ্ঠা–৬৬১

[১৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "ভারত-কলঙ্ক". যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–২৩০

মানবতাবাদ শীর্ষে পৌঁছায়। যদিও, 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা'-কে কীভাবে একজন মানবতাবাদী বলা যায়, তিনি সেই কারণ দর্শাননি। কিছু সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রকে মানবতাবাদী আখ্যা দিতে অস্বীকার করেন। এখানে এই প্রত্যুত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা ছিলেন না। তিনি যা করেছিলেন তা হল, তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগকে আরও সুস্পষ্ট রূপ দান করেছিলেন। তিনি সর্বাত্মক উগ্র বা হিংসাশ্রয়ী ধর্মীয় চিন্তার সমর্থক ছিলেন না, কারণ তাঁর ধর্মীয় ভাবনার ভিত্তি ছিল 'ঈশ্বরের প্রতি প্রেম'-এর আদর্শ এবং তাঁর মতে ঈশ্বর ও মনুষ্যত্বের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাঁর জাতীয়তাবাদের উগ্র অংশের কারণ সম্ভবত তাঁর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ এবং কিছু অনাহূত রূঢ় ব্রিটিশ আধিকারিকের সম্মুখীন হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৭০ এর দশকে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডাফিন তাঁর সাথে বর্বরোচিত ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র আরও মনে করতেন যে, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব উন্নয়নের নিদর্শন।

এর ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা যায়, তনিকা সরকার, এম. কে. হালদার প্রমুখ কিছু বিদ্বান ব্যক্তির মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে দুটি পর্যায় ছিল – একটি তুলনামূলক মুক্ত (open-ended) ও প্রায়শ প্রগতিশীল পর্যায় এবং অপরটি বিচারবিযুক্তিবাদী ও পুনর্জাগরণবাদী পর্যায়।[১৫] বঙ্কিমচন্দ্রের কাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে এই বিভাগ তাঁর চিন্তাভাবনা সম্পর্কে একটি সুসংহত ব্যাখ্যা পেতে সাহায্য করে বলে অনেকে মনে করেন। অনেকে এই বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে তাঁকে মানবতাবিরোধী প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু

[১৫] Sarkar, Tanika. "Imagining a Hindu Nation: Hindu and Muslim in Bankimchandra's Later Writings." *Economic and Political Weekly* 29, no. 39 (September 1994).. p.2553

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে সংগতি বা সামঞ্জস্যের ভীষণ অভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা যুক্তিবাদের পশ্চিমী ধারণায় তাঁর বিশ্বাস ও ভারতীয় শাস্ত্রের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব তাতে ভুগতেন। এবং তিনি যৌক্তিকতার দর্শন থেকে নিজেকে কখনো বিযুক্ত করতে পারেননি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর উপর উপযোগবাদ ও দৃষ্টিবাদের (positivism) এর প্রভাব। এই দুটি তত্ত্বকে তিনি সমালোচনা করলেও তাঁর মতে উপযোগবাদ কোনও ভুল তত্ত্ব নয়। এখানে কেউ যুক্তি দেখাতে পারেন যে, তিনি যৌক্তিক মানবতাবাদীর অধিক একজন ধর্মীয় গোঁড়া ব্যক্তি ছিলেন, যেহেতু তিনি 'সাম্য' প্রবন্ধে প্রকাশিত নিজমত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে সম্ভবত দুটি কারণ ছিল – প্রথমত, চরম যুক্তিনির্ভরতার কুফলকে (যার প্রমাণ ডিরোজিওপন্থিগণ দিয়েছিল) মাথায় রেখে তিনি ঐতিহ্যের উপর যৌক্তিকতার প্রাধান্য মানতে পারেননি, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর মনে হয়েছিল ভারতের মতো দেশে সাম্যের দর্শন তখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যখন ভারতীয়দের মধ্যে একটি পারস্পারিক সাদৃশ্য বোধ থাকবে। তাঁর মতে নিছক যুক্তিচিন্তায় উৎসাহদানের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ গঠন করা সম্ভব না। তাও আপত্তি উঠতে পারে যে, সাম্যের দর্শন ও জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের মধ্যে কোনও আবশ্যিক যোগ নেই। এর প্রত্যুত্তরে বলা যায়, পারস্পারিক প্রচেষ্টা দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধন সম্ভব, যদি সমাজের জনগণের মধ্যে সাদৃশ্য বোধ থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হালদার লিখেছেন, "বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের মূল দফাগুলি ছিল একই সাথে—অব্যবহিত অতীতের প্রতি ঘৃণা, বর্তমানের প্রতি মোহমুক্তি, সুদূর অতীতের প্রশংসা ও হিন্দুদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা। বঙ্কিমের কাছে জাতীয়তাবাদ বলতে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসকদের বিতাড়নের মতবাদ নয়, তাঁর কাছে

এটা ছিল হিন্দুধর্মের চৌহদ্দির মধ্যে ও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সুরক্ষামূলক আশ্রয়ের মধ্যে থেকে জনগণের আরও ভালোভাবে বাঁচার শর্তের নিমিত্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ”।[১৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের ধারণার সম্পর্কে হালদারের মন্তব্যের প্রথম অংশ ভারতের প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর সাধারণ ধারণা, এবং এটি বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের ধারণায় সংযোজিত নতুন কিছু নয়। ডিরোজিওর ধারণাও একই রকম ছিল। আর, উক্ত মন্তব্যের দ্বিতীয় অংশে ব্রিটিশদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশ্বস্ততার কথা বলা হয়েছে তা তাঁর স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য নয়। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রসমাজের প্রায় সকলেই কমবেশি এই ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু হালদারের মন্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এটি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক মুক্তির সম্পর্ক বিষয়ে অন্য একটি সমস্যা নির্দেশ করে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির মতে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা’ প্রবন্ধে মুক্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং তিনি মনে করতেন যে স্বাধীনতাহীন মুক্তি ও মুক্তিহীন স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। কিন্তু এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, মুক্তি ও স্বাধীনতার লক্ষণ নিরূপণের শর্ত বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতেন রাষ্ট্রের প্রজাদের কল্যাণসাধন। মানুষের কল্যাণের চেয়ে মুক্তি ও স্বাধীনতা ভোগ অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি উক্ত প্রবন্ধের শেষ দিকে লিখেছেন, “আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের

---

[১৬] The main planks of Bankim’s nationalism are simultaneous hatred of the immediate past, disenchantment with the present, glorification of a remoter past and hope for a glorious future of the Hindus. Nationalism for Bankim was not a creed for ousting the British rulers from India; it was a plea for better conditions of living for his people within the periphery of Hinduism and under the protective umbrella provided by the British rule of the law

Halder, M. K. *Renaissance and Reaction in Nineteenth Century Bengal.* Calcutta: Minerva Press, 1977. p.117

অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণিস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে"।[১৭]

আনন্দমঠ, বন্দেমাতরম্ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের ধারণা মূর্ত রূপ ধারণ করেছিল তাঁর বৈপ্লবিক উপন্যাস *আনন্দমঠ*-এ। উপন্যাসটি এবং তাতে ব্যবহৃত 'বন্দেমাতরম্' গানটি ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। *আনন্দমঠ*-এ তিনি দেশকে মাতৃমূর্তি রূপে এবং দেশবাসীকে মাতৃভূমির সন্তানরূপে চিহ্নিত করেন। মাতৃভূমিকে চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করা উচিত এবং এই মাতৃভূমি তাঁর প্রতিটি সন্তানের কাছে পূজ্য। যেহেতু মাতা তাঁর সন্তানের অস্তিত্বের সারমর্মের প্রতিভূস্বরূপ তাই তাঁর সন্তানদের পবিত্র কর্তব্য হল মাতার সেবায় সমর্পিত থাকা।[১৮] মাতৃভূমিকে প্রতিটি ভারতবাসীর মাতা ও দেবীরূপে ভূষিত করে বঙ্কিমচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন যে এই দেবীকে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী -এই দেবীত্রয়ীর সমাহার রূপে দেখা উচিত, যেখানে জাতীয় শৌর্য ও দুষ্টের দমনের প্রতীক দুর্গা, জাতীয় সম্পদের পূর্ণতা, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক লক্ষ্মী এবং দেশের শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রাচুর্যের প্রতীক সরস্বতী।[১৯] এখানে ভবানন্দের উক্তি স্মরণযোগ্য, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের

---

[১৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা". যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–২৪৫

[১৮] Ray, Dr. Anil Baran. "Bankimchandra: Development of Nationalism and Indian Identity." *Prabudha Bharata*, August 2005. p.421

[১৯] ঐ, p.421

আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা"।[২০] এই কল্পনারই শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানটিতে। অরবিন্দ ঘোষ লিখেছেন, "ঐ মন্ত্রটি (বন্দেমাতরম্) প্রদত্ত হল এবং একদিনেই সকল মানুষ দেশপ্রেমের ধর্মে দীক্ষিত হল"।[২১] *Encyclopaedia Britannica* -এর সপ্তম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে লিখতে গিয়ে আনন্দমঠ উপন্যাসটির সংক্ষিপ্তসারে আর. সি. দত্ত মন্তব্য করেছেন,

> Of all his works, however, by far the most important from its astonishing political consequences was the "Anandamath" which was published in 1882, about the time of the agitation arising out of the Sannyasi rebellion in 1772…and its culminating episode is a crushing victory won by the rebels over the united British and Mussalman forces, a success which was not followed up, owing to the advice of a mysterious physician who, speaking as a divinely inspired prophet, advices Satyananda, the leader of the 'children of the mother' to abandon further resistance since a temporary submission to the British rule is necessary; for Hinduism has become too speculative and unpractical, and the mission of the English in India is to teach Hindus how to reconcile theoretical speculation with the fact of science…But though "Anandamath" is in form of an apology for the acceptance of British rule, it is nonetheless inspired by the restoration, sooner or later, of a Hindu kingdom in India.[২২]

'আনন্দমঠ' বিশ্লেষণ করে আমাদের দুটি উপলব্ধি হয়—বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশের স্বার্থের প্রাধান্য। উপন্যাসটিতে 'যবন', 'নেড়ে' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগের কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা

---

[২০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "আনন্দমঠ" যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদক, *বঙ্কিম রচনাবলী,* ১ম খণ্ড. কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬০. পৃষ্ঠা–৭২৫

[২১] পোদ্দার, অরবিন্দ. *বঙ্কিমমানস, বঙ্কিম ঐতিহ্য ও বন্দেমাতরম.* কলকাতা: উচ্চারণ, ২০১২. পৃষ্ঠা–২৬৫

[২২] Bagchi, Jasodhara. "Positivism and Nationalism: Womanhood and Crisis in Nationalist Fiction:Bankimchandra's Anandamath." *Economic and Political Weekly* XX, no. 43 (October 1985): p.61

হয়। প্রতিক্রিয়শীলরূপেও অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করার আগে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচ্য। 'বঙ্গদর্শন' -এ 'আনন্দমঠ' মাসিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় ব্রিটিশ সরকার সন্দিহান হয়ে পড়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আনুগত্যের বিষয়ে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশ্বাসঘাতক রূপে সন্দেহ করে। তাই 'আনন্দমঠ' প্রথম প্রকাশের পর ব্রিটিশ সরকার উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। ব্রিটিশ সরকার ও তাদের শাসন সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার মতামত জানাতে বাধ্য করা হয় বঙ্কিমচন্দ্রকে। তাই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কেশবচন্দ্র সেনের কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করার কথা বলে, যিনি নব্য ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ছিলেন ও ব্রিটিশদের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। দেশদ্রোহের অভিযোগ আনার সম্ভাবনা আঁচ করে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রের ভাই কৃষ্ণবিহারী সেনের সাহায্যে কেশবচন্দ্রের কাছে যান যাতে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে উপন্যাসটি সুপারিশ করেন। ব্রিটিশদের পরম অনুগত কেশবচন্দ্র সেনই বঙ্কিমচন্দ্রকে দৃঢ়ভাবে বলেন 'ইংরেজ' শব্দটি বদলাতে। দুর্ভাগ্যবশত, বঙ্কিমচন্দ্র রাজি হয়ে শব্দটি পরিবর্তন করে তার স্থানে 'যবন', 'নেড়ে' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলেন।[২৩]

'আনন্দমঠ'-এ উগ্র জাতীয়তাবাদের আপাত প্রকাশের দরুন বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে 'বন্দেমাতরম্' গানটি মুসলিমবিরোধী ও হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের প্রকাশক, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কট্টর সাম্প্রদায়িক বা সংকীর্ণচেতা ধার্মিক ব্যক্তি—এর কোনোটাই ছিলেন না। বস্তুত, তাঁর হিন্দুত্বের ধারণা আবশ্যিকভাবে প্রশংসাযোগ্য না হলেও তা ছিল

---

[২৩] পোদ্দার, অরবিন্দ. *বঙ্কিমমানস, বঙ্কিম ঐতিহ্য ও বন্দেমাতরম.* কলকাতা: উচ্চারণ, ২০১২. পৃষ্ঠা–২৮৪

ধর্মনিরপেক্ষ, এমনকি যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবশ্যিকতাকে কখনও অস্বীকার করেননি। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহারে তিনি লিখেছেন, "গ্রন্থাকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসুলমানের কোন রকম তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলে ভালো হয় না, মুসুলমান হইলেও মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলে মন্দ হয় না, মুসুলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালো মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। ...অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসুলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ"।[২৪]

তাই এটা সত্য নয় যে তিনি মুসলিম বিরোধী ছিলেন। যে আগ্রাসী মনোভাব তাঁর বিভিন্ন লেখায় পাওয়া যায় তা ইসলাম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে নয়। বরং এটি কিছু বিশেষ মুসলিম ব্যক্তি ও বিশেষ করে ভারতে মুসলিম শাসনের যুগ সম্পর্কে অভিপ্রেত। এবং মুসলিম শাসনের প্রতি আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণ সম্ভবত তাঁর সময়ে মুসলিম শাসনের প্রকৃত ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্যের অপ্রতুলতা। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সংহতির ওপর ভীষণ জোর দিয়েছিলেন। আমরা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণার কথা বিবেচনা করি, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা যায় না, কারণ তাঁর ধর্মের ভিত্তি হল সর্বজনীন প্রেম। তিনি আরও বলেন, "যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণবধর্ম। তখন এ হিন্দু ও মুসুলমান, এ ছোট জাতি ও বড় জাতি এরূপ ভেদজ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদজ্ঞান করে সে বৈষ্ণব নহে"।[২৫]

---

[২৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "আনন্দমঠ" যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদক, *বঙ্কিম রচনাবলী,* ১ম খণ্ড. কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬০. পৃষ্ঠা–৭১৩

[২৫] রহমান, মতিউর এম. *শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র.* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২. পৃষ্ঠা–১৭২

ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যা তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের ভিত্তিস্বরূপ। তাঁর কাছে হিন্দুধর্ম নিছক একটি ধর্ম নয়; এটি একেবারেই ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত, যেহেতু তাঁর মতে হিন্দুরা ধর্ম এবং চিন্তন ও অনুভূতির অন্যান্য বিভাগের মধ্যে কখনও পার্থক্য করতে চায়নি। ফলতঃ, একই নীতি, একই বিবেচনা, এমনকি একই শাসনের দ্বারা তাদের ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবন চালিত হয়। সেই কারণেই তিনি ভারতে জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ গঠনে 'হিন্দুত্বের' সাহায্য নিয়েছিলেন। তিনি মুসলিমদের অবজ্ঞা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্য কখনও এটি ব্যবহার করেননি। কারণ তাঁর কাছে হিন্দুত্বের অর্থ মনুষ্যত্ব বা মানবতার প্রতি প্রেম, তথা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী গণআন্দোলনের সময় 'বন্দেমাতরম্' গানটি জাতীয় মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ লিখেছেন, "৩২ বছর আগে বঙ্কিম এই অসামান্য গানটি রচনা করেছিলেন এবং কতিপয় মানুষ তা শুনেছিল, কিন্তু দীর্ঘ মোহ থেকে জাগরণের আকস্মিক মুহূর্তে বাংলার জনগণ সত্যের অন্বেষণ ঘুরে তাকাল এবং নিয়তি নির্ধারিত এক ক্ষণে কেউ একজন 'বন্দেমাতরম্' গেয়ে উঠল"।[২৬] একইসময়ে, 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম্' -এর বিরুদ্ধেও একটি আন্দোলন হয়েছিল। মুসলিম লিগ ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় এই আন্দোলন শুরু করেছিল। ব্রিটিশদের 'বিভাজন করো ও শাসন করো' নীতি 'সংখ্যালঘুদের সমবেত করো' এই তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যেখানে মুসলিমরা ছিল সংখ্যালঘু। ব্রিটিশ সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মুসলিমদের বাড়তি সুযোগ সুবিধা দিতে শুরু করে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির হানি ঘটে। মুসলিম লিগ ও ব্রিটিশ সরকারের এই জোটের ফলে ১৯৩৬-৩৭ সালে কলকাতায় 'আনন্দমঠের' শতাধিক

[২৬] Haldar, M. (1989). *Foundations of nationalism in India: a study of Bankimchandra Chatterjee*. Delhi: Ajanta Publications. p.191

প্রতিলিপি পোড়ানো হয়েছিল। ‘বন্দেমাতরম্’ মুসলিমবিরোধী বলে দাবি করে মুসলিম লিগ গানটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। মুসলিম লিগের কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হয়ে রেজাউল করিম লেখেন, “বহুদিন হইতে ‘আনন্দমঠে’র প্রতি সরকারের আক্রোশ ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, দেশে যে মুক্তি আন্দোলন হইতেছে, তাহার প্রধান খোরাক জোগাইয়াছে ‘আনন্দমঠ’। ...বর্তমানে ‘আনন্দমঠ’-এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহা যে অদৃশ্য হস্তের গোপন ইঙ্গিতেই হইতেছে, তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। ...তবে একথা প্রত্যেকের জানা দরকার—বহু বর্ষ পরে হঠাৎ আজ ‘আনন্দমঠ’-এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মুসুলমানদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নহে;—তাহার মূল কারণ—মুসলমান যাহাতে মুক্তি-আন্দলোনে যোগ দিতে না পারে, তাহার জন্য ছল বাহির করিবার দুরভিসন্ধি”।[২৭]

‘বন্দেমাতরম্’ গানটির বিরুদ্ধে বহুবিধ আপত্তি আছে। ঐ সকল আপত্তির দুটি ভিন্ন স্তর আছে। প্রথমত, গানটি মিশ্র ভাষায়, তথা বাংলা ও সংস্কৃততে রচিত, যেখানে সংস্কৃতকে দেবভাষা রূপে গণ্য করা হয় এবং তা হিন্দুধর্মের ভিত্তি। তাই কিছুজন মনে করেন যে, গানটি মূলত হিন্দুদের জন্যই। এটিকে সকলের নিমিত্ত একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্তোত্র বলে গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের ক্ষেত্রে মূর্তিপূজার অভিযোগ আছে। গানটিতে কিছু হিন্দু দেবীর নাম থাকায় মনে করা হয় যে এটি মূর্তিপূজায় উৎসাহ দেয়। গানটির মধ্যে মূর্তি পূজার কথা নিহিত আছে মনে করায় মুসলিমরা এটিকে জাতীয় স্তোত্র হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ বিদেশে পড়াকালীন তাকে

---

[২৭] পোদ্দার, অরবিন্দ. *বঙ্কিমমানস, বঙ্কিম ঐতিহ্য ও বন্দেমাতরম.* কলকাতা: উচ্চারণ, ২০১২. পৃষ্ঠা–৩১১

লিখিত একটি পত্রে বলেছেন, "বন্দেমাতরম্ শুধুমাত্র বাংলার প্রতি নিবেদিত একটি স্তোত্র নয়, এটি বিশ্বমাতার প্রতি সমর্পিত একটি স্তোত্র"।[২৮]

তবে মূর্তিপূজার অভিযোগ সঠিক নয়। যেসকল শব্দ প্রয়োগের কারণে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেসব শব্দ বঙ্কিমচন্দ্র রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রায়শই আমরা কোনও কিছুর অর্থ পরিষ্কার করে বলার উদ্দেশ্যে কিছু শব্দ রূপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। একইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সকল শব্দ মাতৃভূমিকে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। মাতৃভূমিকে হিন্দু দেবীর সাথে অভিন্ন দেখানো তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তিনি মাতৃভূমিকে বর্ণনা করতে ঐ হিন্দু দেবীদের নাম ব্যবহার করলেন কেন? ঐ শব্দগুলির পরিবর্তে অন্য শব্দও তো রূপক অর্থে ব্যবহার করা যেত একই বিষয় বর্ণনা করতে। এর উত্তর হল, বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগতভাবে একজন হিন্দু ছিলেন এবং তিনি হিন্দুধর্ম অধ্যয়ন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে মাতৃভূমিকে বর্ণনার উদ্দেশ্যে ঐরূপ নাম ব্যবহারই স্বাভাবিক, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি মুসলিম বিরোধী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ব্রহ্মসংগীতে 'শিব', 'শংকরী', 'শম্ভু', 'বিষ্ণু', 'মহেশ' ইত্যাদি শব্দ থাকে, কিন্তু তার জন্য ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে কেউ মূর্তিপূজার অভিযোগ আনে না।[২৯]

বঙ্কিমচন্দ্র একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাঁর সাহিত্য ও বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনেকে মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখেননি। ফলতঃ, তাঁর মতবাদকে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ রূপে বর্ণনা

---

[২৮] Haldar, M. (1989). *Foundations of nationalism in India : a study of Bankimchandra Chatterjee*. Delhi: Ajanta Publications. p.191

[২৯] পোদ্দার, অরবিন্দ. *বঙ্কিমমানস, বঙ্কিম ঐতিহ্য ও বন্দেমাতরম.* কলকাতা: উচ্চারণ, ২০১২. পৃষ্ঠা–৩১৭

করা যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ কে সম্পূর্ণভাবে পৃথক রাখা অসম্ভব, যেহেতু তাঁর মতে মানুষের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক জীবন পরস্পর বিজড়িত। তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ মূলত তাঁর উপন্যাসগুলির ভিত্তিতে উত্থিত হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র তাঁর উপন্যাসগুলি থেকে তাঁর মত আহরণ বা নিষ্পন্ন করা আমাদের উচিত নয়, কারণ উপন্যাসে কাল্পনিক চরিত্র চিত্রিত হয় এবং তা আবশ্যিকভাবে রচয়িতার নিজমত নাও হতে পারে। ধর্মতত্ত্ব, হিন্দুধর্মের উপর চিঠিপত্র (Letters on Hinduism) এবং তাঁর অন্যান্য দার্শনিক রচনায় উপস্থাপিত তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণার কথা বিবেচনা করলে এটা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, যদিও দেশের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে তিনি ভেবেছিলেন যে দেশপ্রেম হচ্ছে ধর্মের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ, তবুও তাঁর মতের বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগ বজায় রাখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ধর্ম নির্বিশেষে মনুষ্যজাতির সুখবিধান। তাই "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তদের অবস্থার সমান ও যুগপৎ শ্রীবৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষ প্রকৃত অর্থে দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না।[৩০]

---

[৩০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "বঙ্গদেশের কৃষক". যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–২৮৮

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যক্তি-মানুষ

ব্যক্তি হল অখণ্ড ও পূর্ণ সত্তা। তাই, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক থেকে ব্যক্তির বর্ণনা বা ব্যাখ্যা প্রদানের নিমিত্তে বিভিন্ন তত্ত্ব নির্মাণ বোধ হয় যথাযথ হয় না। কোনও তত্ত্ব একক ভাবে, সে দার্শনিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্ব যাই হোক না কেন, অখণ্ড ও পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা প্রদানে অপারগ। মানুষের এই অবিভাজ্য বা অখণ্ডনীয় বৈশিষ্ট্য কোনও ভাবেই এটা প্রমাণ করে না যে, কোনও একটামাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। চরিত্রগত দিক থেকে ব্যক্তির মধ্যে নানা স্তর লক্ষ করা যায়, আর এই প্রত্যেকটি স্তরের ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। ব্যক্তি যেহেতু জগতের প্রায় সমস্ত মূল উপাদানের সমাহার, জীবের প্রত্যেকটি স্তরের সমাহার, সেহেতু ব্যক্তির প্রকৃষ্ট বর্ণনার ক্ষেত্রে সেই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ আবশ্যিক, যে দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ নিখিল জগতের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়।[১] নানা সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সমাজবিদ্ ব্যক্তির প্রকৃত চরিত্র নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ব্যক্তি বা মানুষের স্বরূপ কী সে বিষয়ে নানা দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও সমাজবিদ্ নানা সময়ে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ব্যক্তি ও সমাজের স্বরূপ কীভাবে ও কীরূপে প্রস্ফুটিত এবং প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা বা বিচারের জন্য তাঁর পূর্বসূরীদের বক্তব্যের উল্লেখ ও বিচার আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিচিন্তা ও সমাজচিন্তা কী তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক ও সমাজবিদ্গণের ভাবনাচিন্তার বিরোধী, নাকি তাঁদের

[১] Tillich, Paul. "The Conception of Man in Existential Philosophy." *The Journal of Religion* (The University of Chicago Press) 19, no. 3 (July 1939): pp.201-215.

চিন্তাভাবনার সাথে বঙ্কিমের চিন্তার কোনও সাদৃশ্য আছে—তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও সামাজিক তত্ত্ব পাওয়া যায়—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মতবাদ বা তত্ত্ব হল—গণতান্ত্রিক মতবাদ (democratic theory), উপযোগবাদ (utilitarianism), মার্ক্সবাদ (Marxism), প্রকৃতিবাদ (naturalism), অস্তিবাদ (existentialism) ইত্যাদি। রুশোর এমিল (*Emile*) উপন্যাসে প্রকৃতিবাদী ব্যক্তি-চিন্তার (naturalistic man) প্রকাশ ঘটেছে। উক্ত উপন্যাসে শিক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে রুশো 'ব্যক্তি' সম্পর্কে বলেছেন যে, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হল ভাল মানুষ হয়ে ওঠা । ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি বা স্বরূপ সদা পরিবর্তনশীল, তা স্থির নয়। তা সহজাতও নয়। ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে এই 'হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া বা প্রবণতার দ্বারা'। *দ্য বিয়ার* (*The Bear)* গ্রন্থে ফকনারও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[২] বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও অনুরূপ চিন্তার বীজ লক্ষ করা যায় বলে মনে হয়। তিনি অনুশীলন ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে আদর্শ মানুষ হয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন সেখানে রুশো ও ফকনারের বক্তব্যের আভাস পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক মতবাদানুযায়ী মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে 'কৌম সত্তা' (communal being) এবং 'ব্যক্তির স্বগত সত্তা' (private individual) এই দু'ধরনের সত্তা লক্ষ করা যায়।[৩] কৌম সত্তা হিসাবে মানুষ মানবসমাজ সংক্রান্ত সেই সমস্ত অধিকারগুলি উপভোগ করে যেগুলি তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সমতাকে বজায় রাখে। আর,

---

[২] "In *Emile* human nature is not static; it is developed through a process of becoming. The nature of man is not given; it is developed through an educative process from within."
Fujinaga, Jean T. "The Nature of Man and His Relationship to Society in Rousseau's *Emile* and Faulkner's "The Bear"." *Educational Theory* 15, no. 3 (1965): p.260.
[৩] Rosenow, Eliyahu. "Bourgeous or Citoyen? The Democratic Concept of Man." *Educational Philosophy and Theory* 24 (1992): pp. 44-50.

বুর্জোয়া (bourgeois) হিসাবে মানুষ অন্য মানুষকে তার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় হিসাবে গণ্য করে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি বা মানুষের ধারণাটি সর্বজনীন ও স্বগত (public and private)-এর ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। মার্ক্সের মতে, গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি দ্বৈত জীবন নির্বাহ করে—ব্যক্তিগত জীবন এবং কৌম জীবন। মার্ক্সের মতে এই দ্বৈত জীবন ধারা একটা কূটাভাসের সূচনা করে। তাঁর মতে, এই কূটাভাসের জন্য মানুষ বা ব্যক্তি স্ববিরোধী অস্তিত্বের মধ্যে নিমজ্জিত – যা প্রমাণ করে গণতান্ত্রিক মানুষ বা ব্যক্তি স্বভাবত বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীনতাহীন এবং মানুষের মুক্তি তখনই সম্ভব যদি এই স্ববিরোধকে দূর করা যায়।[৪] মার্ক্সের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির মধ্যে একপ্রকার সাম্যবাদী ব্যক্তিত্ব (communist personality) গড়ে তোলা। কেননা, তাহলেই ব্যক্তি বা মানুষের এই দ্বৈতস্বরূপ বিনষ্ট হবে। সাম্যবাদী ব্যক্তিত্ব গঠিত হলে ব্যক্তির নিজস্ব ও সামাজিক স্বার্থ একত্রিত হয়ে একটা জৈবিক ঐক্য (organic unity) গড়ে উঠবে।[৫] আবার ব্যক্তির স্বরূপ বিষয়ে প্রকৃতিবাদীদের (naturalist)[৬] বক্তব্য হল, "মানুষের বা ব্যক্তির উদ্ভব সম্পর্কে প্রকৃতিবাদের বক্তব্য হল মানুষ ও প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য, এবং এই তত্ত্বে দ্বৈতবাদের আত্মার পৃথক অতিপ্রাকৃতিক অবস্থাকে অস্বীকার করা হয়েছে।"[৭]

---

[৪] Rosenow, Eliyahu. "Bourgeous or Citoyen? The Democratic Concept of Man." *Educational Philosophy and Theory* 24 (1992): 44-50, p.46

[৫] Ibid, p.44

[৬] মূলত তিন ধরণের প্রকৃতিবাদী তত্ত্ব আছে—যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদ (mechanistic naturalism), জৈবিক প্রকৃতিবাদ (biological naturalism) এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিবাদ (psychological naturalism)।
Aubrey, Edwin Ewart. "The Naturalistic Conception of Man." *The Journal of Religion* 19, no. 3 (July 1939): pp.189-190.

[৭] "The naturalistic view of the origin of man holds that man is integral to nature, and rejects the dualism which attributes a separate supernatural status to the soul."
Aubrey, Edwin Ewart. "The Naturalistic Conception of Man." *The Journal of Religion* 19, no. 3 (July 1939): p.191

অস্তিবাদী দর্শন চিন্তায় ব্যক্তির স্বরূপ বিষয়ে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজবিদ্ ব্যক্তির স্বরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সারধর্মকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে ব্যক্তি গঠিত হয় তার সারধর্মের মাধ্যমে। এই সারধর্ম ব্যক্তির অস্তিত্বের পূর্ববর্তী। কিন্তু, অস্তিবাদী দার্শনিক এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্ববর্তী। তাঁদের মতে, ব্যক্তির অস্তিত্বমূলক স্বরূপ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার ওপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতার অস্পষ্টতা অধীনতার স্বরূপকে নির্ধারণ করে। ব্যক্তির জীবন অতিবাহিত হয় এই স্বাধীনতা ও অধীনতার টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে।[৮] ব্যক্তির অস্তিবাদী ব্যাখ্যায় যে স্বাধীনতার কথা বলা হয় তা কিন্তু বিশুদ্ধ ব্যক্তি স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকৃত ব্যক্তি স্বাধীনতার থেকে ভিন্ন। গণতান্ত্রিক ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সামাজিক সীমাবদ্ধতা থাকে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতার সীমা নির্ধারিত হয় সমাজের প্রচলিত নিয়ম নীতির দ্বারা। সেই জন্য কখনও কখনও সামাজিক বিধিনিষেধের বশবর্তী হয়ে ব্যক্তিকে তার নিজস্ব স্বাধীনতা ত্যাগ করতে হয়। এই কারণেই, ব্যক্তি সম্বন্ধে গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে মার্ক্সের বক্তব্য হল এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কী ভাবনা তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভিত্তি বিষয়ে সুদীপ্ত কবিরাজের যে বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও বোধ হয় এরূপ সমস্যা লক্ষ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র যে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ঔপন্যাসিক ছিলেন সে বিষয়ে বোধ হয় কোনও দ্বিমত নেই। তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক পেক্ষাপটে রচিত বঙ্কিমের

---

[৮] Tillich, Paul. "The Concept of Man in Existential Philosophy." *The Journal of Religion* (The University of Chicago Press) 19, no. 3 (July, 1939): pp. 201-215.

উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু ছিল যুগ-সমাজ, নারীর সামাজিক অবস্থান, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি। এর পাশাপাশি বঙ্কিমের সামাজিক ও সাহিত্যিক দায়বদ্ধতা, পাপ-পুণ্য, নীতিবোধ, ইতিহাসভাবনা, ধর্মভাবনা তাঁর উপন্যাস সমূহকে বিশিষ্টতা দান করেছে। নবজাগরণের ফলে বঙ্গ-সমাজে ব্যক্তিচিন্তার প্রাধান্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার প্রভাব দেখা দিয়েছিল। ফলে বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নারীব্যক্তিত্বের পুনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসে। বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাস সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দের মন্তব্য হল, "the earlier Bankim was only a poet and stylist - the later Bankim was a seer and a nation builder"।[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় – ঐতিহাসিক উপন্যাস, যেমন, *দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, মৃণালিনী* ইত্যাদি, সামাজিক এবং তাত্ত্বিক উপন্যাস। *দেবীচৌধুরাণী* উপন্যাসকে তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবেই উল্লেখ করা উচিত। কারণ, এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের প্রয়োগের দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—*বৃষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, কপালকুণ্ডলা* ইত্যাদি। ব্যক্তি বা মানুষ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনাকে আমরা দুটি দিক থেকে আলোচনা করতে পারি। প্রথম, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিশ্লেষণের মাধম্যে—যেখানে আমরা সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের স্বরূপ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনা তুলে ধরব এবং দ্বিতীয়ত, আদর্শ মানুষের স্বরূপ বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা আলোচনা করব।

---

[১] Chatterjee, Bhabatosh, ed. *Bankimchandra Chatterjee: Essays in Perspective*. Delhi, Sahitya Academi, 1974, p.4

বঙ্কিম উপন্যাসের যে সমস্ত চরিত্রগুলি আমরা দেখতে পাই তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই একধরনের দ্বন্দ্বের মধ্যে নিমজ্জিত। এই দ্বন্দ্ব বঙ্কিমের নিজস্ব মনের দ্বন্দ্ব। পাশ্চাত্য নানাবিধ ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা একধরনের দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন—তা হল, একদিকে প্রত্যক্ষবাদী, বুদ্ধিবাদী চিন্তাধারা এবং অপরদিকে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত ঐতিহ্যের ধারণা। বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই নারীচরিত্রের ওপর গঠিত। কিছু ব্যতিক্রমী পুরুষচরিত্র ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু আগাগোড়াই নারীচরিত্র অঙ্কনে বেশি যত্নবান হয়েছেন। রাজেন্দ্রলালের মতে, "গ্রন্থের নায়িকাত্রয়ই সর্বাঙ্গীণ সুন্দরী এবং তদর্থ গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা; তাহার নায়কগুলি কোন মতে উৎকৃষ্ট হয় নাই, এবং গ্রন্থে যে কোন দোষ আছে তাহাদিগ হইতেই ঘটিয়াছে"।[১০] এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ব্যাক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। তাঁর মতে সমাজের সার্বিক উন্নতির প্রাথমিক শর্ত হল প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। ব্যক্তি-মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সমানাধিকার থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষ ও নারীর অধিকারের মধ্যে যে অসমতা ছিল, তা সমাজের সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন। সেই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য নারী চরিত্রের গঠনের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের প্রত্যেকটি নারীচরিত্রকে এমন নিপুণভাবে তিনি গঠন করেছেন যে, আমাদের কখনও মনে হয় না যে, সেই মূল চরিত্রগুলির মধ্যে শিক্ষার অভাব আছে। সেই মূল চরিত্রগুলির মধ্যে হয়তো প্রথাগত শিক্ষার অভাব আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে নীতি শিক্ষা ও বোধের অভাব নেই।

---

[১০] কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উদ্দেশ্য – নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ. ১৩১৭

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নানা প্রবন্ধে ও উপন্যাসে 'মানবপ্রকৃতি' বা 'মানবচরিত্র' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কোন অবস্থায় একজন মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী বলা যাবে এই বিষয়ে তিনি গভীর চিন্তা করেছিলেন। তার ফল স্বরূপ *ধর্ম্মতত্ত্ব* ও *কৃষ্ণচরিত্র*-এর মতন গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে 'মনুষ্যত্ব' কী এবং কীভাবে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় সে বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি। ...যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্ব্বগুণযুক্ত, সর্ব্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি"।[১১] কিন্তু মানবপ্রকৃতি আর মনুষ্যত্ব এক বিষয় নয়। মানবপ্রকৃতি হল বাস্তব বিষয় কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের বিষয়টি হল আদর্শের ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথমদিকের রচনা 'লোকরহস্য' প্রবন্ধে মানুষের কিছু সাধারণ ধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন – মানুষ সাধারণত কোমলাঙ্গ কিন্তু চতুর, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষী ও হিংস, লোভী, প্রবঞ্চক, অর্থগৃধ্ন এবং কামুক। মানুষ বুদ্ধিমান পশু, কিন্তু প্রায়শই তার বুদ্ধি বিবেকচেতনা ও ন্যায়বোধের সাথে সম্পর্কহীন থাকে।

"মনুষ্যত্ব কি?", "লোকরহস্য", "বিড়াল", "ভালবাসার অত্যাচার" "বাঙ্গালীর বাহুবল" ইত্যাদি প্রবন্ধে দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মানুষের চরিত্র বাহ্য পরিবেশে যথা ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের চরিত্রের স্বাভাবিক স্তর হল জৈবিক এবং পাশবিক স্পৃহা মানব চরিত্রে গভীরভাবে প্রোথিত আছে।

---

[১১] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৯০-৫৯১

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মানুষ এখনও পশু প্রকৃতি সম্পন্ন।[১২] মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতার সীমা ও অন্ত নেই। মানুষের মধ্যে পশুবৃত্তি ও স্বার্থপরতা উভয়ই লক্ষ করা যায়। "ভালবাসার অত্যাচার" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "মনুষ্যের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষ (অর্থাৎ প্রকৃত মনুষ্যত্ব তথা সর্বাঙ্গীণ বিকাশ) লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্যস্নেহ অদ্যপি পশুবৎ। পশুবৎ কেননা, পশুদিগেরও বৎস্যস্নেহ দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য, দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে। ...স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা"।[১৩] এই স্বার্থপর ও পশুবৃত্তির থেকে উন্নীত হয়ে অস্বার্থপর হওয়াই আসলে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা। বঙ্কিমের মতে মানুষের লক্ষ্য কেবলমাত্র আত্মসুখবর্ধন নয়, মানুষের লক্ষ্য হল পরসুখবর্ধন। কমলকান্ত তাই বলেছে যে, পরসুখবর্ধন ছাড়া মানুষের স্থায়ী সুখের আর কোনও মূল্য নেই। আত্মমগ্ন মানুষ এখনও এই সত্য বুঝতে পারেনি। কমলাকান্তের আশা এই যে, মানুষ একদিন তার ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করবে।[১৪]

ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে থেকে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে তা ব্যক্তি-মনের স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। তার আগে মূলত পরিবারগত বা গোষ্ঠীগত সত্তা ভিন্ন ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব সমাজে স্বীকৃত ছিল না। ফলত, ব্যক্তির আচার-আচারণ ও জীবননির্বাহ একান্তভাবে পরিবার ও গোষ্ঠীর অনুশাসনের দ্বারা নির্ধারিত

---

[১২] দ্রষ্টব্য, চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "বাঙ্গালীর বাহুবল", যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*. ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১.

[১৩] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "ভালবাসার অত্যাচার". যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*. ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–২১৬

[১৪] দ্রষ্টব্য, চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "আমার মন". যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*. ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১.

হত। কাজেই, সমাজ গঠনের একক হিসেবে ব্যক্তি নয়, পরিবার বা গোষ্ঠীকে ধরা হত। ধীরে ধীরে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি পরিবার ও গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভ করতে থাকে এবং ব্যক্তি সমাজ গঠনের অন্যতম একক হিসেবে উঠে আসে। ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা, নিজস্ব অস্তিত্ব এবং নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করার অধিকার স্বীকৃত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে প্রায় সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যেই ব্যক্তির এই স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রগুলির মূল্যায়ন করতে গিয়ে অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন,

> বঙ্কিমের চরিত্রগুলির মধ্যে কেহই দুর্বলচরিত্র বা কাপুরুষ নয়। এবং কাহারও মধ্যেই ব্যক্তিত্ব বা পৌরুষের অভাব নাই। ব্যক্তি বিশেষ কোনও কারণে কোনও সময় নিন্দিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে ক্ষুদ্র নয়, আত্মাবমাননায় ম্রিয়মান নয়। চরিত্র গঠনের এই বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা সেই যুগধর্মেরই লক্ষণ, আর সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মানস চরিত্রগুলিও ক্ষুদ্র অথবা হীন অথবা শক্তিহীন হইতে পারে না। উদার মানবিক গুণে তাহারা সমৃদ্ধ। ভোগে যেমন তাহাদের আনন্দ, চরম মুহূর্তে তাহা অস্বীকার করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত নয়।[১৫]

তিনি আরও বলেছেন যে, বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রগুলি আসলে বাস্তব-মানুষের প্রতিকৃতি। বাস্তবে মানুষ প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র কিন্তু নিঃসঙ্গ এবং সৃষ্টিশীল। একই রকম ভাবে বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যেও আমরা এই নিঃসঙ্গতার বোধ ও জীবনের প্রতি আকর্ষণ দেখতে পাই। তিলোত্তমা, ভ্রমর, শৈবলিনী, রজনী, রোহিণী, কুন্দ প্রমুখ প্রায় সকল চরিত্রের মধ্যেই আমরা এই দুটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। রোহিণীর বক্তব্যে তারই ছবি ধরা পরে, "রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখে শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে

---

[১৫] পোদ্দার, অরবিন্দ. *বঙ্কিমমানস, বঙ্কিম ঐতিহ্য ও বন্দেমাতরম.* কলকাতা: উচ্চারণ, ২০১২, পৃষ্ঠা–১১৭

পারিব না। আশাও নাই”।[১৬] একই ছবি অমরনাথের বক্তব্যেও দেখতে পাওয়া যায়, “আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারি না কেন? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্যজগতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি বা নাই? আমার অন্তরে যা আছে, তাহা তোমার বাহ্যজগৎ দেখাইবে সাধ্য কি?”[১৭]

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের যথার্থ প্রকাশ ঘটাতে অক্ষম ছিল। সেই কারণেই বোধ হয় বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে এই নিঃসঙ্গতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের উন্নতিতে সমাজ যখন সহায়ক না হয়, তখন মানুষ অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে এবং নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করে। বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে এই নিঃসঙ্গতার পাশাপাশি আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—তা হল সংগ্রামশীলতা। বঙ্কিমের মতে মানুষ নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তার উন্নতির জন্য, স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য এবং অধিকার বজায় রাখার জন্য সে সমাজে প্রচলিত নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করে চলছে। সেই সংগ্রামের চিত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্লট। তাঁর অনন্য সৃষ্টি কমলাকান্তের মধ্যে এই বিষয়টিই ধরা পড়েছে, “আমি একা... এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়ী, অনন্ত জনস্রোত মধ্যে আমি একা, আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোত মধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত

[১৬] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণকান্তের উইল.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৫৬৬

[১৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *রজনী.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ১ম খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬০. পৃষ্ঠা–৫০৫

জলবুদ্বুদসমূহের আর একটি বুদ্বুদ না হই? আমি বারিবিন্দু এই সমুদ্রে মিশাই না কেন?”[১৮] অর্থাৎ মানুষের জীবনপ্রবাহ এই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত আনন্দের উপলব্ধি করার সংগ্রাম।

বঙ্কিম উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। তিলোত্তমা, মৃণালিনী, রজনী, কুন্দনন্দিনী, ভ্রমর এরা সবাই প্রথম শ্রেনির চরিত্র। এদের বৈশিষ্ট্য হল—এরা মৃদু, নিরুচ্চার, কোমল, স্নিগ্ধ এবং লাবণ্যময়ী। অন্যদিকে মতিবিবি, বিমলা, আয়েশা, মনোরমা, লবঙ্গলতা, শৈবলিনী এবং জেবউন্নিসা হল দ্বিতীয় শ্রেণির নারীচরিত্র। এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—এরা প্রখর দীপ্ত, বিচিত্ররূপিণী এবং রহস্যাবৃত। কিন্তু এছাড়াও প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্যে এই দুই শ্রেণির নারীচরিত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের নারিচরিত্রগুলির মধ্যে মূলত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি, বঙ্কিমের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে একধরনের সীমালঙ্ঘন করার মনোবৃত্তি দেখা যায়। তনিকা সরকার মনে করেন যে, বঙ্কিমের নারীরা কোনওভাবেই কেবলমাত্র সংসারী-নারী নয়।[১৯] বঙ্কিমের নারীচরিত্রগুলি এতটাই দৃঢ় যে তারা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভাললাগা, প্রেম এবং তাদের চারিত্রিক উন্নতি ও চাহিদাগুলিকে বজায় রাখার জন্য পদে পদে সমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে অগ্রাহ্য করে। নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তারা অনেকাংশে নির্লিপ্ত ছিল। আয়েশা চরিত্রটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিজে মুসলমান হয়েও একজন হিন্দু পুরুষের প্রতি তার প্রণয় এতটুকুও কম ছিল না। ভারতীয় সমাজে যে আন্তধর্মীয় বিবাহ প্রায় নিষিদ্ধ এটা জানা সত্ত্বেও সে জগৎসিংহকে

---

[১৮] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. “কমলাকান্ত”. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৫০

[১৯] চৌধুরী, সত্যজিৎ, সম্প্রা. *বঙ্কিম-১৭৫.* কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৪. পৃষ্ঠা–১৩০

ভালবেসেছিল। সেনাপতি ওসমানের সামনেই জগৎসিংহকে উদ্দেশ্য করে আয়েষা নির্ভিকভাবে বলেছিল, "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর"।[২০] সরোজমোহন মিত্রের মতে, আয়েষার এই উক্তি সমসাময়িক ঘরোয়া বাঙালি নারীর পক্ষে একান্ত অবাস্তব। কিন্তু এই উক্তির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র নারীর ব্যক্তিসত্তার নির্দেশ করেছেন। ধনবাদী সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি নারী স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। উৎপাদনকারী শ্রমিক হিসেবে নারী পুরুষের ব্যবধান যত কমতে থাকে, সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠা ততই বাড়তে থাকে। কাজেই, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ধনবাদী আদর্শ প্রধান না হওয়ার সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসের মাধ্যমে নারীর সচেতন ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখিয়েছেন।[২১] *মৃণালিনী* উপন্যাসের নায়িকা মনোরমার চরিত্রের মধ্যেও আমরা নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভাবনা দেখতে পাই।

নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতার যথার্থ প্রকাশ পেয়েছে *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসের ভ্রমর চরিত্রের মধ্যে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির স্বাধিকার ও সমাজের অতিপরিচিত সমস্যা অর্থাৎ সমাজ ও পরিবারের ভারসাম্যের সমস্যার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। গোবিন্দলাল, ভ্রমর এবং রোহিণী এই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে। ভ্রমর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সতীশচন্দ্র বসু লিখেছেন, "ভ্রমর রমণীরত্ন। প্রেমের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। পতিপ্রেম ও কর্ম্মানুরাগ এই দুই ভাবে তাহার চরিত্র গঠিত। এই ভাবের মধ্যে প্রথমটি উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও সহজবোধ্য, দ্বিতীয়টি অতি অস্পষ্ট জটিল ও দুর্বোধ্য"।[২২] রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের সম্পর্ক নিয়ে ভ্রমরের মনে কিছু

---

[২০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *দুর্গেশনন্দিনী*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*. ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–১২৩

[২১] চক্রবর্তী, শিবেন্দু শেখর, সম্পা. *আত্মবিকাশ*. কলকাতা, ২০১২. পৃষ্ঠা–১২৯

[২২] বসু, সতীশচন্দ্র. "ভ্রমর". যতীন্দ্রমোহন দত্ত সম্পাদিত, *জন্মভূমি*, ১৩১৭

সংশয় হওয়ায় সে গোবিন্দলালকে চিঠি লিখে জানায়, "তুমি মনে জান বোধ হয়, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারাও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারাও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই"।[২৩] ভ্রমরের এই চিঠি নারী স্বাধীনতার এক অন্যতম দৃষ্টান্ত। তৎকালীন সমাজে যেখানে পতিপ্রেম নারীর আদর্শ হিসেবে গণ্য হত, সেখানে ভ্রমরের এই চিঠি নিঃসন্দেহে এক অন্য নারী-চেতনার সাক্ষ্য। আমরা একথা বলতে পারি যে বঙ্কিম কখনও এমনটা মনে করতেন না যে, নারীর উচিত সর্বদা তার স্বামীকে ভালবাসা এবং ভক্তি করা। পুরুষ মাত্রেই যে নারীর ভক্তির পাত্র, তা তিনি মনে করতেন না। পুরুষ ততক্ষণই ভক্তির পাত্র বলে বিবেচিত হবে যতক্ষণ সে তার আত্ম-মর্যাদা বজায় রাখবে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলার মধ্যেও অনুরূপ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। ননদ শ্যামাসুন্দরীর এক প্রশ্নে কপালকুণ্ডলা দৃঢ় কণ্ঠে বলে যে, "ইহাতে তিনি (নবকুমার) অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানতেম, স্ত্রীলোকের বিবাহ, দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না"।[২৪] তথাকথিত হিন্দু সমাজব্যবস্থায় বিবাহিত সংসার জীবনই হল নারীর সব কিছু। কিন্তু এই বিবাহ নামক সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি কপালকুণ্ডলার বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিস্বাধীনতারই পরিচায়ক।

---

[২৩] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণকান্তের উইল.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৫৭২

[২৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কপালকুণ্ডলা.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–১৭৫

কপালকুণ্ডলার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এতটাই তীব্র যে, তার স্বাধীনভাবে চলাফেরার ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবন বাধা সৃষ্টি করায় সে বিবাহকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অফুরন্ত আত্মমর্যাদাবোধ ঢেলে দিয়েছেন। তবে এই নারীর এই স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ উচ্ছৃঙ্খলতাকে নির্দেশ করে না। সেই কারণেই নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলার সাথে রাত্রিবেলা বনের মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন কপালকুণ্ডলা প্রতিবাদী সুরে বলে, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও"।[২৫]

বঙ্কিমচন্দ্র নারীত্বকে শক্তির সাথে তুলনা করেছেন। *আনন্দমঠ* উপন্যাসে দেখা যায় তিনি নারীরূপী দুর্গা মূর্তিকে ব্যবহার করে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার পথ প্রশস্ত করেছেন। *দেবী চৌধুরাণী* ও *সীতারাম* উপন্যাসেও তিনি নারীত্বের এই একই রূপ চিত্রিত করেছেন। শান্তি, প্রফুল্ল, জয়ন্তী, শ্রী প্রমুখ চরিত্ররা যেভাবে আক্রান্ত সমাজকে রক্ষা করেছে, যেভাবে পরিবারে নিজেদের অধিকার বজায় রাখার জন্য লড়াই করেছে তা নারীর শক্তিরূপেরই পরিচায়ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের উন্নতি ও বিকাশের জন্য সমান অধিকার থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়ে তিনি নারী ও পুরুষের সমানাধিকার বিষয়েও চিন্তাভাবনা করেছেন। *সাম্য* গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে, বঙ্কিমচন্দ্র নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন। মিলের দ্বারা প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে, পুরুষের ন্যায় নারীরও শিক্ষা, পৈতিক সম্পত্তি, প্রয়োজনানুসারে বিধবার পুনর্বিবাহ

---

[২৫] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কপালকুণ্ডলা.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–১৭৫

ইত্যাদি বিষয়ে সমান অধিকার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে *সাম্য* গ্রন্থটি আর প্রকাশ করেননি। যদিও উক্ত গ্রন্থের কিছু অংশ তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে ছাপিয়েছেন। *সাম্য* গ্রন্থে প্রকাশিত সাম্যনীতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কেন এই গ্রন্থ আর প্রকাশিত করলেন না সে বিষয়ে ঠোস কোনও যুক্তি বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও দিয়ে যাননি এবং বঙ্কিম-গবেষকরাও এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করেননি। তবে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছিলেন যে, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা নিরিখে বঙ্গসমাজ সাম্যতত্ত্ব গ্রহণ করতে অপারগ। হিন্দুধর্মের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের যে আঘাত তখন এসেছিল তার বিরুদ্ধেই কলম ধরাকে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করেছিলেন। এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্য সাম্যতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করতে শুরু করেন। তবে একথা ঠিক বলেই মনে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র কখনও সম্পূর্ণরূপে সাম্যতত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারেননি। কারণ তিনি যে 'ধর্ম'[২৬] প্রচার করেছেন তার মূল লক্ষ্যই হল 'সকলের হিত'।

অধ্যাপক প্রয়াস সরকার *সাম্য* গ্রন্থে বঙ্কিমের নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের তত্ত্বকে যৌক্তিক ও দার্শনিক বলে মন্তব্য করলেও তিনি মনে করেন যে *ধর্ম্মতত্ত্বে* বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে নারীকে পুরুষের অধ্যস্তন বলেছেন তা একেবারেই তার এই বিষয়ে প্রাথমিক চিন্তার বিরোধী। অধ্যাপক সরকারের মতে, *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে বঙ্কিম দেখিয়েছেন যে, নারী পুরুষের থেকে যেহেতু শারীরিক সক্ষমতার নিরিখে দুর্বল সেহেতু পুরুষকেই নারীকে রক্ষা করতে হবে এবং নারীর কাজ হল পুরুষের সেবা করা ও ঐশ্বরিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পুরুষকে সাহায্য করা। নারী সম্পর্কে বঙ্কিমের এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মতে মনুবাদী ধর্মশাস্ত্রের

[২৬] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তি অধ্যায়ে করা হয়েছে।

প্রতি বঙ্কিমের অধিক পক্ষপাতিত্বকে নির্দেশ করে।[২৭] কিন্তু অধ্যাপক সরকারের এই সমালোচনা সর্বাংশে সঠিক নয় বলেই মনে হয়। কারণ, আমরা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে, সেখানে বঙ্কিমের লক্ষ্যই হল কীভাবে মানুষের সকল বৃত্তিগুলির যথার্থ অনুশীলনের ফলে সমুচিত স্ফুর্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় তা ব্যাখ্যা করা। এই আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু কখনও এমন বলেননি যে, যেহেতু নারী পুরুষের তুলনায় শারীরিক ভাবে দুর্বল তাই সে কখনও অনুশীলন ধর্ম পালন করে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারবে না। এমনকি তিনি এটাও বিশ্বাস করেন না যে, নারী আত্মরক্ষায় অক্ষম। তাঁর মতে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এমন যে নারীকে তার শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। *ধর্ম্মতত্ত্বে* তিনি লিখেছেন, "স্ত্রী অন্যভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বহুপুরুষপরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাসবশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। ...অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে"।[২৮] এই বিষয়ে যশোধরা বাগচীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই *সাম্য*-র পঞ্চম পরিচ্ছেদে জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখাতে অনুপ্রাণিত হয়ে নারীর সমান সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে যে লেখা বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন তা তিনি পরে আর লেখেননি। কিন্তু তা বলে নারীর অধীনতা তিনি কোনোদিনও মেনে নেননি। বীরত্বের রক্তাভা তাঁর শেষ উপন্যাসের প্রধান

[২৭] Sarkar, Proyash. "Bankimchandra on Morality." *Philosophy in Colonial India*. Ed. Sharad Deshpande. Springer India, 2015. pp. 225-238.

[২৮] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী,* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬৫৮

নারীচরিত্রগুলিকে রাঙিয়ে তুলেছে”।[২৯] *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে তাই একস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, যে স্বামী ভক্তির অযোগ্য তার প্রতি স্ত্রী-এর ভক্তি থাকা অবাঞ্ছনীয়।

মানুষের এই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ মানুষের মধ্যে আরও একটি মনোবৃত্তির জন্ম দেয়—তা হল সীমালঙ্ঘনকারী মনোবৃত্তি। 'সীমালঙ্ঘন' শব্দটি সাধারাণত নঞর্থক বিষয়কে বোঝানোর জন্য ব্যবহিত হয়ে থাকে। কিন্তু বঙ্কিম-সৃষ্ট নারীচরিত্রের এই সীমালঙ্ঘনকারী মনোবৃত্তির মধ্যে কোনও নঞর্থকতা নেই। বরং এই মনোবৃত্তি তাদের সদর্থক বৈশিষ্ট্য। সীমালঙ্ঘনকারী মনোবৃত্তি আসলে পুরুস্তান্ত্রিক সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ ক্ষমতার ভিত্তি। ভ্রমর, কপালকুণ্ডলা, মনোরমা, রজনী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যেই আমরা প্রচলিত সামাজিক নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করার প্রবণতা দেখতে পাই। গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরের থেকে বিদায় নিল তখন দেবতার প্রতি ভ্রমরের আর্তনাদ, “কেহ আমাকে বলিয়া দাও—আমার কি দোষে, এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দশা ঘটিল, আমার পুত্র মরিয়াছে – আমার স্বামী ত্যাগ করিল”।[৩০] ভ্রমরের এই আর্তি আসলে সমাজের প্রতিই। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এটাই মনে করা হত যে সংসারের যাবতীয় অশুভের মূল হচ্ছে নারী, নারীর জীবনের যে কষ্ট তারও কারণ নারী নিজেই—ভ্রমরের আর্তনাদ আসলে এই সামাজিক চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কপালকুণ্ডলার মধ্যেও অনুরূপ মনোবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলা বিবাহকে দাসীত্ব মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত দেবী ভবানীর পায়ে আত্মসমর্পন করার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করে। সুদীপ্ত কবিরাজ, যশোধরা বাগচী প্রমুখ ব্যক্তি বঙ্কিম-সৃষ্ট নারীচরিত্র গুলির মধ্যে এই

---

[২৯] চৌধুরী, সত্যজিৎ, সম্পা. বঙ্কিম-১৭৫. কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৪. পৃষ্ঠা–১৩৩

[৩০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণকান্তের উইল.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৫৮২

মনোবৃত্তির উপস্থিতির কথা বলেছেন। যশোধরা বাগচী লিখেছেন, "সীমা-লঙ্ঘনকারী রোম্যান্টিকতার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আমরা আরও পাই যেভাবে কঁতীয়-নারীত্বের সংজ্ঞাকে তিনি নতুন করে উপস্থাপিত করেছেন। পুরুষকেন্দ্রিক মেধাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য কঁৎ নারীত্বকে মানবতার প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেন—কারণ সমাজে 'হৃদয়'-এর সঞ্চার মেয়েরাই করে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে এই নারী হয়ে ওঠে শক্তিরূপিণী"।[৩১]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মানুষ সাধারণত স্বার্থপর নয়। মানুষ পরোপকারী এবং পরদুঃখকাতর। তাঁর সৃষ্ট বহু চরিত্রের মধ্যেই মানুষের এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি "আমার মন" প্রবন্ধে বলেছেন যে, "আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই"।[৩২] কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, অমরনাথ, ভ্রমর, এমন কী গোবিন্দলাল প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে এই গুণগুলি দেখা যায়। উল্লেখিত এই দুটি গুণের মূর্তিমান চরিত্র হল কপালকুণ্ডলা। নিজের মনের মধ্যে নবকুমারের কোনও হদিস না পাওয়া সত্ত্বেও কপালকুণ্ডলা নবকুমারের প্রতি সমব্যাথী। কপালকুণ্ডলা এতটাই পরোপকারী এবং পরদুঃখকাতর যে, নিজের অনিষ্টের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে সে কাপালিকের হাত থেকে অচেনা নবকুমারের প্রাণ রক্ষা করেছে। এমনকি সে নিজের সামাজিক অবস্থান, নিজের চরিত্রের পবিত্রতা, কৃতকর্মের ফলাফল ইত্যাদি উপেক্ষা করে তার ননদের জন্য একাকী নিশিথ রাত্রিতে বনের মধ্যে ওষুধ সংগ্রহে গেছে। কপালকুণ্ডলার পরোপকারী চিত্তের ব্যাপ্তি বোঝা যায় যখন সে নবকুমারের পূর্বপত্নী মতিবিবির দুঃখে কাতর হয়ে নিজের স্বামী নবকুমারকে দান করার

---

[৩১] চৌধুরী, সত্যজিৎ, সম্পা. *বঙ্কিম-১৭৫.* কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৪. পৃষ্ঠা–১৩২

[৩২] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "আমার মন". যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬০

ইচ্ছা প্রকাশ করে। কপালকুণ্ডলা হল বঙ্কিমচন্দের সৃষ্ট নারী-চরিত্র যে, পরোপকারী ও পরদুঃখকাতরতায় পরিপূর্ণ। এরূপ গুণের অধিকারিণী হওয়ার ফলে কপালকুণ্ডলা যখনই যে বিপদে পড়ে তার কাছে সাহায্য চেয়েছে তাকে সাহায্য করেছে—সে অচেনা নবকুমার হোক বা নিজের ননদ হোক বা নিজের স্বামীর প্রেমপ্রার্থিনী। যেস্থলে সে পরোপকারে নিয়োজিত সেক্ষেত্রে কোনও সামাজিক বিধিনিষেধ তাকে আবদ্ধ করতে পারেনি। এমনকি তার একাকী গভীর রাত্রে বনের মধ্যে যাওয়ার বিষয়ে নবকুমার আপত্তি করলেও সে নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেয় যে, "তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না"।[৩৩] ইতঃপূর্বে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানেও দেখতে পাওয়া যায় যে তার বিবাহিত জীবন পরোপকার ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে বিঘ্নের কারণ হওয়ায় সে বিবাহ কে দাসীত্বের সঙ্গে তুলনা করেছে।

"কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসের নায়ক নবকুমারের মধ্যেও অনুরূপ গুণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাগমনকালে যখন তাদের নৌকা এক অচেনা সৈকতে এসে উপস্থিত হয়, পাকাদির কাঠ আহরণের জন্য নবকুমার নিজের অনিষ্ট ও ভবিতব্যের কথা চিন্তা না করে, কেবলমাত্র নৌকায় উপস্থিত অন্যান্য সহযাত্রীদের উপকারার্থে একা গভীর অচেনা জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল। এই ঘটনা নবকুমার যে পরোপকারী তারই পরিচায়ক। নবকুমারের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল সে সাহসী, আত্মত্যাগশীল, পরোপকারী ইত্যাদি। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী প্রত্যেকের মধ্যেই এই একই গুণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। নগেন্দ্রনাথ, সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী মধ্যে ত্রিকোণ প্রেমের গল্পই হল "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের প্লট। এই তিন মূল চরিত্র ছাড়াও আছে কমলমণি, হীরা প্রভৃতি

---

[৩৩] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কপালকুণ্ডলা.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–১৭৫

পার্শ্বচরিত্র। কুন্দনন্দিনী অতি অল্প বয়সে বিধবা হলে সূর্য্যমুখী তার দুঃখে কাতর হয়ে কুন্দনন্দিনীকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের প্রণয়াসক্ত ছিল। কমলমণি যখন কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্রনাথের প্রতি তার প্রণয় নিয়ে সতর্ক করে তখন কুন্দনন্দিনী বুঝতে পারে যে, তার এই প্রণয় আকাঙ্ক্ষা সূর্য্যমুখীর সংসার বিনষ্ট করছে। নিজের সুখের জন্য কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীকে কষ্ট দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। তাই, নগেন্দ্রনাথকে না দেখতে পাওয়ার দুঃখ চেপে রেখে, পরের অর্থাৎ সূর্য্যমুখীর কল্যানের ও সুখের জন্য কুন্দনন্দিনী কমলমণির সাথে কলকাতা যেতে রাজি হয়।

বঙ্কিম-সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে "রজনী" উপন্যাসের অমরনাথের চরিত্র নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠভাবে চিত্রিত হয়েছে। এক অন্ধ মেয়ের (রজনী) জীবনের গল্প নিয়ে এই উপন্যাসের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। রজনী ও অমরনাথ উভয়ের মধ্যে দিয়েই মানুষের পরোপকারী ও আত্মত্যাগ ইত্যাদি গুণ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমের এই উপন্যাসের লক্ষ্য হল মানসিক ও নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই "রজনী" উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, "যে সকল মানসিক ও নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য অন্ধ যুবতীর সাহায্যে তাহা বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে"।[৩৪] রজনী গোপালের সাথে তার বিবাহ রুখতে যখন গৃহত্যাগ করে এবং বিপদে পড়ে তখন অমরনাথ তাকে রক্ষা করে। অমরনাথের এই সাহায্যের প্রতিদান হিসেবে রজনী তাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়। যদিও রজনীর ভালবাসা, প্রেম সবই শচীন্দ্রের প্রতি। কিন্তু অমরনাথ যখন এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয় তখন সে নিজে থেকে শচীন্দ্রের সাথে রজনীর মিলনের পথ প্রশস্ত করে

[৩৪] বসু, শ্রীলেখা. *বঙ্কিম-চর্চা.* কলকাতা: গ্রন্থমিত্র. ২০০৮. পৃষ্ঠা–৫৩

দেয়। রজনীও অমরনাথের এই আত্মত্যাগের কথা জানার পর নিজের ছেলের অমরনাথ নামকরণ করে সেই আত্মত্যাগের বিষয়কে স্মরণীয় করে রেখেছিল।

বঙ্কিমের মতে, পরোপকারী হওয়া, পরদুঃখেকাতর হওয়া, অন্যের জন্য বিশেষ করে সমাজের জন্য আত্মত্যাগ করা ইত্যাদি গুণগুলি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। এক্ষত্রে বোধহয় তিনি মানুষ সম্পর্কে মিল ও বেন্থামের দ্বারা প্রভাবিত। মিল তার গ্রন্থে বলেছেন,

> "...Utility or Happiness, considered as the directive rule of human conduct. But it is by no means an indispensable condition to the acceptance of the utilitarian standard; for the standard is not the agent's own greatest happiness, but the greatest amount of happiness altogether; and if it may possible be doubted whether a noble character is always the happier for its nobleness;, there can be no doubt that it makes other people happier... Utilitarianism, therefore, could only attain its end by the general cultivation of nobleness of character...."[৩৫]

অর্থাৎ উপযোগবাদ অনুযায়ী মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রক নিয়ম হল 'উপযোগ' বা 'সুখ বা মঙ্গল'। কিন্তু এই সুখ কেবলমাত্র কর্মকর্তার নিজের সুখ নয়, অন্যের সর্বাধিক সুখ। মানুষের মহত্ত্ব নির্ভর করে অন্যের বৃহত্তর সুখের চিন্তার ওপরে। মানুষের উচিত প্রত্যেকের মধ্যে এই মহৎ গুণের পরিচর্যা করা। কারণ এই মহৎ গুণের পরিচর্যার মাধ্যমেই সমাজের অন্যান্য মানুষের সুখ পরিবর্ধন সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে একই কথা

[৩৫] Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. Harvard University, 1862. p.244

বলেছেন। তাঁর মতে মানুষের পরম ধর্ম হল পরের হিত বা কল্যান করা। প্রীতিবৃত্তির আলোচনাকালে তিনি বলেছেন যে, নিজের হিতের পরিবর্তে অন্যের হিতসাধন করাই মানুষের উচিত। অন্যের অনিষ্ট করে কখনও নিজের হিতসাধন করা কাম্য নয়। এমনকি যেক্ষেত্রে নিজের ও পরের সুখ তুল্যমূল্য সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পরের হিতসাধন করাই মানব-ধর্ম। তিনি লিখেছেন, "...পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিঘ্নকর এবং যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্দ্বারা আপনার হিতসাধন করিবে না, ইহা অনুশীলনধর্ম্মের এবং হিন্দুধর্ম্মের আজ্ঞা"।[৩৬] অমরনাথ চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীলেখা বসু তাই যথার্থই লিখেছেন যে, "অমরনাথের আত্মকথনের মাঝে প্রায়শই যেন কমলাকান্তরূপী বঙ্কিম আত্মপ্রকাশ করেছেন। বস্তুত, অমরনাথ উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের প্রতিনিধিস্থানীয়, যার মনোভূমি বেন্থামের হিতবাদ ও কোঁতের পজিটিভিজমের মিশ্রণে গঠিত"।[৩৭]

---

[৩৬] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬৫৩

[৩৭] বসু, শ্রীলেখা. *বঙ্কিম-চর্চা.* কলকাতা: গ্রন্থমিত্র. ২০০৮. পৃষ্ঠা–৫৭

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ মানুষ

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এই বৃক্ষের বৃদ্ধি"।[১] বঙ্কিমের মতে ইন্দ্রিয়াসক্তি হল মানুষের নিকৃষ্ট গুণ এবং প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা হল মহৎ গুণ। মানুষের জীবনে দুঃখের মূল কারণ হল এই ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং চিত্তের অসংযম। চিত্তকে যে ব্যক্তি সংযত করতে পারে সে সুখী হয়, অন্যথায় দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাঁর মতে মানুষ মাত্রেই উচিত তার চিত্তকে সংযত করা আর তা করতে গেলে প্রয়োজন অনুশীলন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আদর্শ মানুষের ধারণা

বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব আলোচনাকালে দেখা যাবে যে তাঁর মতে মানুষ মাত্রেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী নয়। প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে গেলে মানুষকে তার শারীরিক ও মানসিক সকল বৃত্তিগুলির সম্যক অনুশীলন করতে হবে যাতে সকল বৃত্তিগুলির যথার্থ স্ফুর্তি ও পরিণতি লাভ করে।[২] বঙ্কিম এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে আজ পর্যন্ত এরূপ কোনও মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব নেই যে নিজের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক অনুশীলনের

---

[১]চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *বিষবৃক্ষ.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ১ম খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬০. পৃষ্ঠা-৩০৯-১০

[২] এই গবেষণা সন্দর্ভের 'ধর্ম' নামক অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাধ্যমে চরম স্ফুর্তি ও পরিণতি ঘটিয়েছে। সকল বৃত্তির এই অনুশীলন আদর্শ সাপেক্ষ। কোনও আদর্শ আমাদের সামনে উপস্থিত না থাকলে অনুশীলন করা অসম্ভব। তিনি লিখেছেন,

> গুরু। যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমন ভরসা আছে, যুগান্তরে মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণবর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, এরূপ একটি আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে উপস্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই।[৩]

যেহেতু বাস্তবে এরূপ আদর্শ মানুষের কোনও দৃষ্টান্ত নেই তাই বঙ্কিম ঈশ্বরকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। কারণ ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাঙ্গীন স্ফুর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। তবে তাঁর মতে নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হতে পারেন না। কারণ, প্রথম নিরাকার ঈশ্বর অশরীরী, আমরা শরীরী এবং দ্বিতীয়ত, তিনি অনন্ত কিন্তু আমরা সান্ত ও ক্ষুদ্র। ফলত, সগুণ ঈশ্বরই আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে পারেন। এই সর্বগুণসম্পন্ন সগুণ ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকলে এবং তাঁর প্রতি অবিচল ভক্তি থাকলে তবেই ঈশ্বরানুকৃত স্বভাব প্রাপ্তি হবে। কিন্তু অনুশীলনের প্রথমাবস্থায় অনন্তগুণের অধিকারী ঈশ্বর মানুষের আদর্শ হতে পারেন না। কারণ ঈশ্বর

---

[৩] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৯২

অনন্তপ্রকৃতির হওয়ায় সীমিত মানুষের পক্ষে তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব। সেই কারণে বঙ্কিম বলেছেন যে, অনুশীলনের প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের অনুকারী মানুষ অর্থাৎ যাঁদের মধ্যে গুণাধিক্য আছে এবং যাঁদের ঈশ্বরাংশ বলে বিবেচনা করা হয় অথবা যাঁদের মানবদেহধারী ঈশ্বর বলে মনে হয়—তাঁরাই মানুষের আদর্শ হিসেবে গ্রহণীয়। এক্ষেত্রে তিনি জনকাদি রাজর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, *রামায়ণের* রামচন্দ্র এবং *মহাভারত*-এর কৃষ্ণের উদাহরণ দিয়েছেন। কৃষ্ণই তাঁর মতে আদর্শ মানুষ। তিনি লিখেছেন,

> তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন। ...তাহার পশ্চাতে ঈশ্বরের সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাঁহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। ...যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাহাকে নমস্কার করি।[৪]

ধর্ম্মতত্ত্বের এই আদর্শ মানবতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থের মাধ্যমে। এই গ্রন্থের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করা। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার কিনা সেই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা করলেও, এই গ্রন্থে তাঁর মূল উদ্দেশ্য হল কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, বরং কৃষ্ণের মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ। তিনি লিখেছেন, "আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও

---

[৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫১৪

আমার উদ্দেশ্য নহে। এই গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব"।[৫] কৃষ্ণের চরিত্র বিষয়ে *মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবৎ* এবং অন্যান্য পুরাণে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য *মহাভারত*-কেই বেছে নিয়েছেন। এর কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ভারতবর্ষে যত প্রাচীন গ্রন্থ আছে তার মধ্যে *মহাভারত* এবং *রামায়ণ*-কেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, কৃষ্ণের জীবনে দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন। যিশু খ্রিষ্ট, গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ ধর্মবেত্তাগণও ধর্ম প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁদের সাথে কৃষ্ণের ধর্ম প্রচারের পার্থক্য আছে। বঙ্কিমের মতে দুটি উপায়ে ধর্মের প্রচার সম্ভব—প্রথম, ধর্ম সম্পর্কে উপদেশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, নিজের কার্যসমূহকে ধর্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। যিশু এবং বুদ্ধ উভয়েই প্রথমোক্ত উপায়ে ধর্মের প্রচার করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ নিজ কার্যের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেছেন। সেই কারণে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, কৃষ্ণের গুরুত্ব বেশি। কেননা, তাঁর মতে, উপদেশের থেকে কর্মের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার অনেক বেশি ফলদায়ক। এই কারণেই কৃষ্ণকে তিনি শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক, ধর্মজ্ঞ ও আদর্শ হিসেবে স্বীকার করার আরও কারণ আছে। *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে বঙ্কিম বলেছেন যিনি আদর্শ ব্যক্তি তাঁর সকল বৃত্তিগুলির অর্থাৎ শারীরিক, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পূর্ণ স্ফুর্তি ঘটেছে। যিশু খ্রিষ্ট বা বুদ্ধের মধ্যে সকল বৃত্তিগুলির যথার্থ স্ফুর্তি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণতি লক্ষ করা যায় না। তিনি লিখেছেন,

---

[৫] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪০৭

> যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীস্টে তাহা নাই – কৃষ্ণে তাহা আছে। যিশুকে যদি রোমক সম্রাট য়িহুদার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না – কেন না, রাজকার্য্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া...যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসনকার্য্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। পুনশ্চ ... যুদ্ধে তাঁহার (যিশুর) শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। ...কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য...(কিন্তু) ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগ্যতা প্রবৃত্ত হইতেন। ...কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। ...অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাস ধর্মকে অসম্পূর্ণ ধর্ম বলে মনে করতেন। তাঁর মতে সন্ন্যাস ধর্ম প্রবৃত্তিমার্গকে বর্জন করে নিবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করার কথা বলে। অর্থাৎ কর্মই যেহেতু দুঃখের ও বন্ধনের মূল তাই কর্ম করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে অনুশীলন ধর্মের প্রচার করেছেন সেখানে তিনি কৃষ্ণ-সম্মত ধর্মের কথাই বলেছেন। প্রত্যেক মানুষের উচিত কর্ম করা। কোনও ব্যক্তি কর্মহীনভাবে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। তবে নিষ্কাম চিত্তে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম পালনই হল অনুশীলন ধর্ম তথা কৃষ্ণ কথিত ধর্মের মূল কথা। যিশু, বুদ্ধ বা চৈতন্য যেহেতু সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক ধর্ম প্রচার করেছেন, তাই তাঁরা মানুষের প্রকৃত আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। কেননা, যিনি আদর্শ হবেন তিনি সকল প্রকার মানুষেরই আদর্শ হবেন। এই কারণেও বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, কৃষ্ণই হলেন শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি লিখেছেন, "কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী,

---

[৬] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫১৬

ধর্ম্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের এবং একাধারে সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ"।[৭] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কোনভাবেই যিশু বা বুদ্ধকে ছোট করে দেখেননি। তাঁর মতে উভয়ই মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁরা সারাজীবন ধর্ম প্রচার করেছেন এবং মানুষের হিতসাধন করেছেন। যদিও বঙ্কিমের মতে জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ধর্ম প্রচার এবং যিশু ও বুদ্ধ উভয়েই এই কাজ যথার্থ ভাবে করেছেন তবুও তাঁরা আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে পারেন না। তার মূল কারণ হল, আদর্শ পুরুষ তিনিই হবেন যিনি ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সমস্ত কর্মও পালন করবেন। এই কারণেই কৃষ্ণ আদর্শ হিসাবে গৃহীত অন্যেরা নন। তিনি লিখেছেন, "...কেহই না মনে করেন যে, যিশুখ্রীষ্ট বা শাক্যসিংহের, বা ধর্ম্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র লাঘব করিবার ইচ্ছা করি। যিশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, সকলই তাঁহার অনুষ্ঠেয়। ...যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ"।[৮]

আদর্শ পুরুষ মাত্রেই জ্ঞানে সুপণ্ডিত, বিচারে দক্ষ, কর্মে তৎপর, ধর্মাত্ম এবং সুরসে রসিক হবেন। কৃষ্ণের মধ্যে এই সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁর প্রত্যেকটি বৃত্তির যথাবিহিত অনুশীলন হয়েছে এবং চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। কৃষ্ণ কর্তৃক কংশবধ ঘটনা উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পরায়ণ, ধর্মাত্মা, পরহিতে রত এবং পর দুঃখে কাতর। কৃষ্ণের অন্যান্য বৃত্তি

---

[৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫১৬

[৮] ঐ, পৃষ্ঠা.-৫১৫-১৬

গুলি প্রসঙ্গেও তিনি *মহাভারত* থেকে নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তার ব্যাখ্যা করেছেন। গোপিনীদের সাথে কৃষ্ণের রাসলীলাকে তিনি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগমাত্র, কিন্তু গোপী-পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা"।[৯] কৃষ্ণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার আগে প্রশ্ন ওঠে যে, কৃষ্ণ মানুষ নাকি অবতার? বিভিন্ন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করা হয়। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার কিনা, এই বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছুই আলোচনা করেননি, তবুও ঈশ্বর জগতে অবতীর্ণ হতে পারেন কিনা সে বিষয়ে বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন।

অবতারবাদ ও ঈশ্বরাবতরের সম্ভবনা

'অবতার' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে 'অব' শব্দ পূর্বক তৃ ধাতু থেকে, যার অর্থ হল 'অবতরণ করা' বা 'নেমে আসা'। অর্থাৎ 'অবতার' শব্দের অর্থ হল ঈশ্বরের জীবদেহ ধারণ করে জগতে অবতরণ করা। 'অবতার' শব্দটি তুলনামূলকভাবে আধুনিক শব্দ। বৈদিক সাহিত্যে অবতার শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের জগতে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে 'আবির্ভাব'[১০] শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হত। *মহাভারত, রামায়ণ* এবং বিভিন্ন পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভগবান বিষ্ণু দুষ্টের দমনের জন্য অবতাররূপ গ্রহণ করেন। *ভাগবৎ পুরাণ* অনুযায়ী বিষ্ণুর অসংখ্য অবতার। *মহাভারত, মৎস্য পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, পদ্ম পুরাণ* এবং *বরাহ পুরাণে* বিষ্ণুর দশাবতারের কথা উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর দশটি অবতার

---

[৯] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪৫৮

[১০] *তস্য তচ্চেতসো দেবঃ স্তুতিমিত্থং প্রকুর্বতঃ।*

আবির্বভূব ভগবান্ পীতাম্বরধরো হরিঃ।। বিষ্ণুপুরাণ, ১/২০/১৪

হল যথাক্রমে— ১. মৎস্য, ২. কূর্ম, ৩. বরাহ, ৪. নরসিংহ, ৫. বামন, ৬. পরশুরাম, ৭. রাম, ৮. কৃষ্ণ, ৯. বুদ্ধ এবং ১০. কল্কি।[১১]

অবতারবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর কখনও কখনও মানুষ অথবা অন্য কোনও প্রাণীর রূপ ধারণ করে এই জগতে অবতরণ করেন। এই অবতারবাদ বিষয়ে মূল সমস্যাগুলি হল — প্রথম, ঈশ্বর কি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে পারেন? দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর যদি প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তাহলে ঈশ্বরের সাথে তাঁর অবতারের সম্পর্ক কীরূপ হবে? তৃতীয়ত, ঈশ্বরের এই জগতে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী? ইত্যাদি। যাঁরা ঈশ্বরবাদ[১২] স্বীকার করেন না তাঁরা ঈশ্বরের অবতারও স্বীকার করেন না। তাঁদের মূল যুক্তি হল যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বই নেই, সেহেতু তাঁর অবতাররূপ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ বা তাঁর অনস্তিত্ব সাধক প্রমাণ বিষয়ক আলোচনা বর্তমান গবেষণা পত্রের আলোচ্য বিষয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তবুও তিনি খুব স্পষ্টভাবে ঈশ্বর স্বীকারের সপক্ষে কোনও যুক্তি প্রদর্শন করেননি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তাঁর মতে ঈশ্বর ব্যতিরেকে ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান অসম্ভব। যে ধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাঁর মতে সেই ধর্ম অপূর্ণ ধর্ম।[১৩] *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, “...যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি

---

[১১] *ভাগবৎ* পুরাণে ২২টি অবতারের কথা উল্লেখে আছে, যথা— ১. পুরুষ, ২. বরাহ, ৩. নারদ, ৪. নর এবং নারায়ণ, ৫. কপিল, ৬. দত্তাত্রেয়, ৭. যজ্ঞ, ৮. ঋষভ, ৯. পৃষ্ঠাথু, ১০. মৎস্য, ১১. কূর্ম, ১২. ধন্বন্তরি, ১৩. মোহিনী, ১৪. নরসিংহ, ১৫. বামন, ১৬. পরশুরাম, ১৭. বেদব্যাস, ১৮. রামচন্দ্র, ১৯. বলরাম, ২০. কৃষ্ণ, ২১. বুদ্ধ এবং ২২. কল্কী।

[১২] এই মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর অস্তিত্বশীল। ঈশ্বরবাদের বিভিন্ন প্রকার আছে, যেমন — একেশ্বরবাদ, বহুঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ইত্যাদি।

[১৩] দ্রষ্টব্য, চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *Letters on Hinduism.* শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত. *বঙ্কিম-প্রতিভা.* কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস, ১৩৪৫

পরকাল হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি"।[১৪]

ঈশ্বরবাদ যাঁরা স্বীকার করেন তাঁদের মধ্যে যেমন ঈশ্বরের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে, তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়েও তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক মূলত দুটি তত্ত্ব পাওয়া যায়—নির্গুণ ঈশ্বরবাদ এবং সগুণ ঈশ্বরবাদ। নির্গুণ ঈশ্বরবাদানুযায়ী ঈশ্বর স্বরূপত নির্গুণ, অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনও গুণ নেই, আর যেহেতু ঈশ্বরের কোনও গুণ নেই, সেহেতু এটা অসম্ভব যে ঈশ্বর মানুষের বা অন্য কোনও প্রাণীর রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। নির্গুণ ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর যদি সগুণ হতেন, তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁর অবতার গ্রহণ করা সম্ভব হত। এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মত হল, ঈশ্বর আছেন এবং তিনি সগুণ। নির্গুণ স্বভাব বিশিষ্ট ঈশ্বরে বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল না। তাঁর মতে, নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একটি নিরর্থক বিষয়। কারণ নির্গুণ ঈশ্বরকে আমরা কোনওভাবেই জানতে পারি না। বঙ্কিমের মতে, আমাদের মধ্যে এমন কোনও শক্তি নেই যার সাহায্যে আমরা নির্গুণ ঈশ্বরের ধারণা লাভ করতে পারি।[১৫] অর্থাৎ যেভাবে আমাদের ঘট, পট ইত্যাদি বস্তুর জ্ঞান হয়, সেভাবে নির্গুণ ঈশ্বরেরও জ্ঞান হওয়া উচিত। কিন্তু ঠিক সেইভাবে আমরা নির্গুণ ঈশ্বরকে জানতে পারি না। যাঁরা নির্গুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁরাও এই বিষয়ে একমত যে, যেমনভাবে অন্যান্য বিষয় বা বস্তুর জ্ঞান আমাদের হয়, তেমনভাবে নির্গুণ ঈশ্বরের জ্ঞান হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, আমরা মুখে নির্গুণ

[১৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬০৫

[১৫] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪৩২

ঈশ্বরের কথা বলতে পারলেও, নির্গুণ ঈশ্বর আসলে কী তা আমরা বুঝতে পারি না। যেমন, মুখে আমরা বলতে পারি যে, 'চতুষ্কোণ গোলক', কিন্তু এই চতুষ্কোণ গোলক বলতে ঠিক কী বোঝায় তা আমরা বুঝতে পারি না। সেই কারণে এরকম 'চতুষ্কোণ গোলক'-এর মতন শব্দগুলিকে নিরর্থক শব্দ বলা হয়। এটাও স্বীকার করা হয় যে চতুষ্কোণ গোলক বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। সুতরাং, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, যেহেতু আমাদের মধ্যে এমন কোনও চিত্তবৃত্তি নেই যার সাহায্যে আমরা নির্গুণ ঈশ্বরকে বুঝতে পারি, সেহেতু নির্গুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। এই প্রসঙ্গে আমরা ম্যান্সেল (Mansel)-এর বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি, তাঁর মতে, "…our conception of deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge."[১৬] অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, আমাদের জ্ঞানের শর্তের দ্বারা সীমায়িত। নির্গুণ ঈশ্বর স্বীকার না করার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের আরও যুক্তি হল যে, নির্গুণ ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তিনি লিখেছেন,

> তোমাদের ইংরেজিতে যাহাকে "Absolute" বা "Unconditional" বলে, তাহাই নির্গুণ। যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিনি নির্গুণ তাঁহার কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না। যিনি নির্গুণ, যাঁহার কোন "Condition of Existence" নাই বা বলা যাইতে পারে না—তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাঁহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে। নির্গুণবাদে উপাসনা নাই।[১৭]

---

[১৬] Mansel, H. J. Metaphysics or the Philosophy of Consciousness. Edinburgh: A and C Black, 1860. p.384

[১৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬২৫

যাঁরা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁরা সবাই যে ঈশ্বরের অবতারতত্ত্ব স্বীকার করেন তেমনটা নয়। সগুণ ঈশ্বরবাদীদের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে দু'ধরণের মত দেখতে পাওয়া যায়—ঈশ্বর সগুণ এবং সাকার আর ঈশ্বর সগুণ কিন্তু নিরাকার। বঙ্কিমচন্দ্র সাকার ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। *ধর্ম্মতত্ত্ব*-এর একস্থানে তিনি লিখেছেন যে, "আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও স্বীকার কর"।[১৮] কিন্তু যাঁরা নিরাকার ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করেন তাঁরা ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে পারেন কিনা সে বিষয়ে আপত্তি করে বলেন যে, যেহেতু ঈশ্বর নিরাকার, সেহেতু ঈশ্বরের পক্ষে মানুষ কিংবা অন্য কোনও প্রাণীর দেহ ধারণ করে জগতে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র নিরাকার ঈশ্বর স্বীকার করলেও তিনি ঈশ্বরের অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ। সুতরাং যিনি সর্বশক্তিমান তাঁর পক্ষে দেহ ধারণ করা অসম্ভব নয়। অন্যদিকে যদি আমরা এটা অস্বীকার করি যে, ঈশ্বর নিরাকার হওয়ায় তিনি চাইলেই দেহ ধারণ করতে পারেন না, তাহলে ঈশ্বরকে আর সর্বশক্তিমান বলা যাবে না। ঈশ্বরকে যেভাবে লক্ষনায়িত করা হয়েছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের যা স্বরূপ, সেখান থেকে একথা বলা যায় না যে, তিনি চাইলেও দেহ ধারণ করতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর হলেন এই

---

[১৮] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী,* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬০৫

জগতের স্রষ্টা, ঈশ্বরই এই জগতকে আকার দিয়েছেন। সুতরাং যিনি এই জগতকে আকার দিয়েছেন, তিনি নিজে আকার ধারণ করতে পারেন না, একথা স্বীকার করা যায় না।[১৯]

নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা আরও আপত্তি করে বলতে পারেন যে, ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান, সেহেতু অবতার গ্রহণ না করেও ঈশ্বর জগতের মঙ্গলসাধন করতে পারেন। তাঁর জন্য ঈশ্বরকে মানুষের আকার ধারণ বা দেহ ধারণ করতে হবে কেন? ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময় হওয়ায়, তিনি চাইলেই এক নিমেষে জগতের সমস্ত পাপ বিনষ্ট করে, জগতের মঙ্গল সাধন করতে পারেন। বরং, ঈশ্বর যদি মানুষের আকার ধারণ করে জগতের মঙ্গল ঘটাতে চান, তাহলে তাঁকে মানব জীবনের যাবতীয় দুঃখ, যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। ঈশ্বর পূর্ণাত্মা হওয়ায় তাঁকে দুঃখ ভোগ করতে হবে, একথা স্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে উক্ত আপত্তির কোনও সারবত্তা নেই। তাঁর মতে, জাগতিক সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে থাকে না। কেবলমাত্র মানুষই জাগতিক সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। ঈশ্বর মানুষের বা অন্য কোনও প্রাণীর আকার ধারণ করে এই জগতে আবির্ভূত হলেও, জাগতিক কোনও বিষয় তাঁকে স্পর্শ করে না। *কৃষ্ণচরিত্র*-এ তিনি লিখেছেন,

> যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটি কথা আছে যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল দুঃখ—গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ। তাহাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি সুখদুঃখের অতীত,—তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট

[১৯] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪৩২

নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাঁহার লীলা (manifestation), এ সকল তেমনি তাঁহার লীলামাত্র হইতে পারে।[২০]

ঈশ্বরের অবতার গ্রহণের বিরুদ্ধে কেউ এমন আপত্তি করতে পারেন যে, ঈশ্বর অস্তিত্বশীল এবং তিনি জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হলেও, একথা বলা যায় না যে, ঈশ্বর স্বয়ং স্বহস্তে জগৎ পরিচালনা করেন। ঈশ্বর কতকগুলি অমোঘ নিয়ম সৃষ্টি করেছেন, আর এই জগৎ সেই অমোঘ নিয়ম সমূহের দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং, গাড়ীর চালকের মতন বা নৌকার নাবিকের মতন জগত পরিচালনা করার জন্য ঈশ্বরকে মানবদেহ ধারণ করতে হয়, একথা যথার্থ নয়। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট অমোঘ নিয়মের দ্বারাই যে জগৎ পরিচালিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁর মতে, জগতের পরিচালনার জন্য অমোঘ নিয়মগুলি থাকলেও, ঈশ্বর নিজে থেকে জগতের কোনও কাজ করতে পারেন না, একথা স্বীকার করা যায় না। তাঁর যুক্তি হল, জগৎ ধীরে ধীরে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জগতে এমন কোনও কিছুই নেই যার কিনা চরম উন্নতি ঘটে গেছে। তাঁর মতে, সৃজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ইত্যাদি কাজের মতন আরও একটি নৈসর্গিক কাজ আছে, তা হল 'উন্নতি'। জগত এবং জীবের প্রভূত উন্নতি এখনও বাকি আছে। জীবের উন্নতির মূলে আছে ধর্মের উন্নতি, আর এই ধর্মের উন্নতির জন্য অমোঘ নিয়ম ব্যতিরেকে ঈশ্বর অবতাররূপ গ্রহণ করে এই জগতে আবির্ভূত হতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

মনুষ্যের উন্নতির মূল, ধর্ম্মের উন্নতি। ধর্মের উন্নতিও ঐশিক নিয়মে সাধিত হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়মফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে পারে, ঈশ্বর

---

[২০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪৩৩

কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব?[২১]

ঈশ্বরাবতরের প্রয়োজনীয়তা

এখন প্রশ্ন হল ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, জগতের নৈতিক শৃঙ্খলা যখন বিপন্ন হয়, তখন সেই নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হন। *ভগবদ্গীতা*-র চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে বলেছেন,

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।।

পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।[২২]

অর্থাৎ, যে যে সময়ে ধর্মের হানি ঘটে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, ঈশ্বর সেই সেই সময়ে নিজেকে সৃজন করেন। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন—অর্থাৎ ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ অথবা অন্য প্রাণীর রূপ ধারণ করে জগতে অবতীর্ণ হন। *ভাগবৎ পুরাণে* বলা হয়েছে, যেহেতু মানুষ সর্বদা মহান ব্যক্তিদের পথ অনুসরণ করে, সেহেতু মানুষের নৈতিক শিক্ষার জন্য এবং মানুষকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর জগতে অবতীর্ণ হন।[২৩]

---

[২১] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪৩৪

[২২] *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* ৪/৭ এবং ৪/৮

[২৩] *মর্ত্যাবাতারস্তিহ মর্ত্যশিক্ষণং রক্ষোবধাইয়েব ন কেবলং বিভোঃ। ভাগবদ পুরাণ,* ৫/১৯/৫

ঈশ্বরের অবতার গ্রহণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আরও একটি প্রয়োজনের কথা বলেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে অনুশীলনধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে আদর্শ মানুষের কথা বলেছেন। আদর্শ মানুষ বলতে তিনি এমন ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন যিনি যথাবিহিত অনুশীলনের দ্বারা তাঁর সমস্ত বৃত্তিগুলির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য পরিণতি ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে নির্দিষ্ট আদর্শ যদি না থাকে তাহলে ব্যক্তির পক্ষে তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন সম্ভব হবে না। তিনি আরও মনে করেন যে, মানুষের মধ্যে এখনও পর্যন্ত এমন কোনও মানুষ আমরা দেখতে পাই না, যার এরূপ সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছে। ফলত, আদর্শ হিসেবে ঈশ্বরকেই গ্রহণ করতে হবে এবং সেই ঈশ্বর অবশ্যই সগুণ ঈশ্বর।[২৪] বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি ঘটানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেই জন্য ব্যক্তির প্রয়োজন একজন আদর্শ, যে আদর্শকে সামনে রেখে ব্যক্তি তার সমস্ত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন করবে। নিরাকার ঈশ্বরকে ব্যক্তি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। তার কারণ এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যায়, প্রথম, তিনি অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বর অশরীরী অর্থাৎ শারীরিক বৃত্তি তাঁর নেই। ফলত, ব্যক্তির শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের জন্য নিরাকার ঈশ্বর আদর্শ রূপে গৃহীত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর অনন্ত প্রকৃতির আর ব্যক্তি সান্ত প্রকৃতির, তাই সান্ত জীবের পক্ষে অনন্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ঈশ্বরকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করা অসম্ভব। এই কারণে, বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তাহলে তাঁকে আদর্শ করে ব্যক্তি তার বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন করতে পারে। সুতরাং, তাঁর মতে, ঈশ্বরের

---

[২৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*. ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৯২-৫৯৩

অবতাররূপ গ্রহণের অন্যতম প্রয়োজন হল এই 'আদর্শ মানব', যাতে জীব তাঁকে অনুসরণ করে নিজেদের কর্ম করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

> অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম্ম জানে না; কর্ম্ম কিরূপে করিলে ধর্ম্মে পরিণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশি সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?[২৫]

অবতারবাদের দার্শনিক পর্যালোচনা

ঈশ্বর প্রকৃত অর্থে অবতার গ্রহণ করেন কিনা সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন। যদি এটা স্বীকার করা হয় যে ঈশ্বরের অবতার গ্রহণের বিষয়টি সত্য, তাহলে একটি বিশেষ অধিবিদ্যক সমস্যার উৎপত্তি হয়—তা হল তাদাত্ম্যের সমস্যা (problem of identity)। অর্থাৎ, ঈশ্বর ও তাঁর অবতার কী একে অপরের সঙ্গে অভিন্ন? আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, ভগবান বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার শ্রীকৃষ্ণ কী একে অপরের সঙ্গে অভিন্ন? অর্থাৎ যে সমস্ত গুণাবলী বিষ্ণুর মধ্যে আছে, সেই সমস্ত গুণাবলী কী কৃষ্ণের মধ্যেও আছে? যদি বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ অভিন্ন না হয়, তাহলে কৃষ্ণকে আর বিষ্ণুর অবতার বলা যাবে না। কেননা, কৃষ্ণকে যদি প্রকৃতার্থে ঈশ্বরাবতার হতে হয়, তাহলে কৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত গুণ থাকতে হবে। অবতারবাদের চিরাচরিত ধারানুযায়ী ঈশ্বর ও

---

[২৫] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৪৩৩

তাঁর অবতার একে অপরের সাথে অভিন্ন।[২৬] ঈশ্বর বলতে বোঝায় যিনি অসীম, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ। কৃষ্ণ যেহেতু ঈশ্বরাবতার, সেহেতু তাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণ উপস্থিত। অন্যদিকে কৃষ্ণ মানুষ বলে তাঁর মধ্যে মানুষের যাবতীয় গুণাবলী, যেমন— সসীম শক্তি, সসীম জ্ঞান ইত্যাদিও আছে। অর্থাৎ কৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরের যাবতীয় গুণ এবং মানুষের যাবতীয় গুণ বর্তমান। এখানেই মূল সমস্যাটা দেখা যায়। কৃষ্ণ ঈশ্বর হওয়ায় তাঁর মধ্যে অসীম শক্তি আছে এবং মানুষ হওয়ায় তাঁর মধ্যে সসীম শক্তিও আছে, তাঁর মধ্যে যেমন অসীম জ্ঞান আছে, তেমনি তাঁর মধ্যে সসীম জ্ঞানও আছে। অর্থাৎ কৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর বিরোধী গুণ আছে—যা স্পষ্টভাবে যুক্তিবিজ্ঞানের বিরোধ-বাধক নিয়মকে (law of non-contradiction) লঙ্ঘন করে। বিরোধ-বাধক নিয়ম অনুযায়ী, কোনও কিছুর মধ্যে একই সঙ্গে একইভাবে কোনও বিশেষ ধর্ম এবং তার বিরোধী ধর্ম থাকতে পারে না। অথচ অবতারবাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের মানব অবতারের মধ্যে একই সঙ্গে ঈশ্বরের যাবতীয় গুণ এবং তার বিরোধী মানুষের যাবতীয় গুণ আছে। কিন্তু, বিরোধ-বাধক নিয়মানুযায়ী, কোনও কিছুর মধ্যে, সে ঈশ্বর হোক বা অবতার হোক বা কোনও মানুষ হোক, একই সময়ে, একইভাবে পরস্পর বিরোধী গুণ বা ধর্ম থাকতে পারে না।

যদি অবতারবাদ স্বীকার করে নিতে হয়, তাহলে উক্ত সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। উক্ত সমস্যা সমাধানে মূলত দুধরণের মতবাদ পাওয়া যায়—চরমপন্থী এবং নরমপন্থী মতবাদ। চরমপন্থী মতাবলম্বীরা এই সমস্যার সমাধান হিসেবে বিরোধ-বাধক নিয়মটাকেই

---

[২৬] একে Chalcedonian thesis বলা হয়। Chalcedon ছিল প্রাচীন খৃষ্টান কেন্দ্র। Chalcedon-এর প্রথম পরিষদে খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বেশ কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছিল। তার মধ্যে অবতারতত্ত্ব (incarnation) অন্যতম বিষয় ছিল।

অস্বীকার করেন। যেহেতু এঁরা চরমার্থে অভিন্ন শব্দটিকে গ্রহণ করেন, সেহেতু তাঁরা বিরোধ-বাধক নিয়মটাকে অস্বীকার করেন। চরম অর্থে দুটি বস্তু অভিন্ন বলতে বোঝায় যে, একটি বস্তুর মধ্যে যা যা ধর্ম আছে, সেগুলি দ্বিতীয় বস্তুর মধ্যেও উপস্থিত আছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে যা যা গুণ আছে সেই সমস্ত গুণ ঈশ্বরের অবতাররূপের মধ্যে থাকলে, তবেই আমরা ঈশ্বর ও তাঁর অবতাররূপকে অভিন্ন বলতে পারব। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা দেখা দেবে। তাই, অবতারবাদ স্বীকার করতে হলে এটা বলতে হয় যে, বিরোধ-বাধক নিয়ম ঈশ্বর ও তাঁর অবতারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অতএব ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে কোনও ধর্ম এবং তার বিরুদ্ধ ধর্ম থাকতে পারে। যদি একথা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এই যুক্তিকে সম্প্রসারিত করে বলা যায় যে, অবতারের মধ্যে একই সময়ে, একইভাবে 'মানুষ হওয়া' এবং 'মানুষ না হওয়া', 'অবতারত্ব' এবং 'অবতারত্বের অভাব' উভয়ই ধর্মই থাকতে পারে। অবতারতত্ত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যদি বিরোধ-বাধক নিয়মকে অস্বীকার করা হয় এবং বলা হয় যে, কোনও বস্তুতে কোনও বিশেষ ধর্মের উপস্থিতি সেই বস্তুতে সেই বিশেষ ধর্মের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে না, তাহলে যেকোনো 'ধর্মগত পার্থক্য'-কে (property distinction) অস্বীকার করতে হয়—যা যৌক্তিকভাবে অস্বীকার্য। এক্ষেত্রে আমরা গেরেথ মূর-এর (Gereth Moore, ১৯৪৮-২০০২) অবতারতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি, "অবতারবাদ একধরণের ঐশ্বরিক রহস্যকে প্রকাশ করে যা ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব"।[২৭] সোরেন

[২৭] "The doctrine of incarnation expressed a divine mystery which we mere mortals could not expect to understand."
Morris, V. Thomas. *The Logic of God Incarnate. Ithaca*. New York: Cornell University Press, 1986. p.24-25

কিয়ের্কেগার্ড-এর (Soren Kierkegaard, ১৮১৩-১৮৫৫) মতে, অবতারতত্ত্ব আমাদের চিন্তার সমস্ত নিয়মাবলিকে লঙ্ঘন করে।

অন্যদিকে নরমপন্থীরা অভিন্ন শব্দটিকে এরকম চরম অর্থে গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে, দুটি বস্তুর মধ্যে সমস্ত গুণ উপস্থিত থাকলে তাদের অভিন্ন বলা যাবে, অন্যথায় তাদের অভিন্ন বলা যাবে না, এমনটা নয়। তাঁরা আপেক্ষিক অভিন্নতার (relative identity) কথা বলেন। তাঁরা মনে করেন যে, যদি দুটি বস্তুর মধ্যে কিছু বিশেষ গুণের সাদৃশ্য থাকে, তাহলেও ঐ দুটি বস্তুকে একে অপরের সাথে অভিন্ন বলা যায়। অর্থাৎ এঁদের মতে, ঈশ্বরের মানব অবতারের মধ্যে ঈশ্বর ও মানুষের সমস্ত গুণ উপস্থিত নেই, বরং, এমন কিছু বিশেষ গুণ আছে যেগুলি ঈশ্বরের মধ্যেও আছে এবং তাঁর অবতারের মধ্যেও উপস্থিত আছে। সেই কারণেই ঈশ্বর ও তাঁর অবতারকে অভিন্ন বলা হয়। অর্থাৎ এঁদের মতে, যদি এইভাবে অভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে অবতারবাদ স্বীকারের সাথে সাথে বিরোধ-বাধক নিয়মকেও স্বীকার করা যায়। কিন্তু কীভাবে অবতারবাদ ও বিরোধ-বাধক নিয়মকে একই সঙ্গে স্বীকার করা যাবে, সে বিষয়ে নরমপন্থীগণ কোনও যথার্থ উত্তর প্রদান করেননি। কিন্তু একথাও ভাবা যেতে পারে যে, চরমপন্থিরা যেমন অবিরোধিতার নিয়মকে অস্বীকার করেন, তেমনি নরমপন্থীদের মত মেনে নিলে অন্য একটি নিয়মকে অস্বীকার করতে হয়—সেটা হল অভিন্নতার পার্থক্য-রাহিত্য নিয়ম (principle of indiscernibility of identities)। লাইবনিজ্ (Gottfried Wilhelm Leibniz, ১৬৪৬-১৭১৬) প্রদত্ত এই নিয়ম অনুযায়ী, যদি গ যেকোনো একটি ধর্ম হয় এবং ক ও খ দুটি বস্তু হয়, তাহলে, যদি ক এবং খ একে অপরের সাথে অভিন্ন হয়, তাহলে গ ধর্মটি ক-এর মধ্যে থাকবে যদি এবং কেবল যদি গ ধর্মটি খ-এর মধ্যেও

থাকে।[২৮] অর্থাৎ এই নিয়ম অনুযায়ী, যেকোনও ধর্ম বা গুণ সেটা যদি ঈশ্বরের মধ্যে থাকে, তাহলে সেই ধর্ম বা গুণকে অবশ্যই ঈশ্বরের অবতাররূপের মধ্যেও থাকতে হবে, একমাত্র তখনই ঈশ্বর ও তাঁর অবতাররূপকে অভিন্ন বলা যাবে। কিন্তু অভিন্নতার পার্থক্য-রাহিত্য নিয়ম মেনে নিলে, নরম্পন্থীদের যে দাবী অর্থাৎ কিছু কিছু গুণ যদি ঈশ্বর ও তাঁর অবতাররূপের মধ্যে একই ভাবে থাকে, তাহলে ঈশ্বর ও তাঁর অবতাররূপের মধ্যে অভিন্নতার দাবী করা যাবে, তা আর বলা যায় না। তাহলে, বিরোধ-বাধক নিয়ম স্বীকার করলে যেমন অবতারতত্ত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, তেমনি অভিন্নতার পার্থক্য-রাহিত্য নিয়ম স্বীকার করলেও অবতার তত্ত্বের মূল সমস্যার সমাধান করা যায় না।

কিছু দার্শনিকদের মতে অবতারতত্ত্বের সাথে বিরোধ-বাধক নিয়মের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপেক্ষিক অভিন্নতার তত্ত্ব স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা নেই। এক্ষেত্রে দু'ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। প্রথম, একদলের মতে, অবতারতত্ত্ব বিরোধ-বাধক নিয়মকে লঙ্ঘন করে, তার কারণ হল, প্রকৃতার্থে ঈশ্বর ও প্রকৃতার্থে মানুষ হওয়ার জন্য যে যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, সেই গুণাবলী সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা আছে। থমাস ভি মরিসের (Thomas V. Morris) মতে, 'সম্পূর্ণ মানুষ' (truly human) এবং 'নিছক মানুষ' (mere human)-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। অর্থাৎ কোনও মানুষ 'সম্পূর্ণ' হলে সে 'নিছক' মানুষ হতে পারে না, আবার কেউ 'নিছক' মানুষ হলেও, সে 'সম্পূর্ণ' মানুষ নাও হতে পারে।[২৯] যেমন, দ্বিমাত্রিক বর্গক্ষেত্রের মতন, যেকোনও ঘনবস্তুও হল 'সম্পূর্ণ' আয়তক্ষেত্র। কিন্তু ঘনবস্তু 'নিছক' আয়তক্ষেত্র নয়, কেননা ঘনবস্তু ত্রিমাত্রিক হয়। ঘনবস্তু

---

[২৮] Principle of indiscernibility of identity-এর যৌক্তিক আকারটি হল— $(x)(y)[x=y \rightarrow (P)(Px \leftrightarrow Py)]$

[২৯] Morris, V. Thomas. The Logic of God Incarnate. Ithaca. New York: Cornell University Press, 1986. p.165

যদি 'নিছক' আয়তক্ষেত্রের হত, তাহলে তার মধ্যে এই বিশেষ ধর্মটি থাকত না। ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের অবতার মানুষ হলেও তিনি 'সম্পূর্ণ মানুষ', 'নিছক মানুষ' নয়। 'নিছক মানুষ'-এর ক্ষেত্রে সসীম শক্তি, সসীম জ্ঞান থাকলেও, 'সম্পূর্ণ মানুষ' হওয়ায় অবতারের মধ্যে সেই ধর্মগুলি উপস্থিত নেই। ঈশ্বরের অবতার 'সম্পূর্ণ মানুষ', কেননা তাঁর মধ্যে মানুষ হওয়ায় অন্যান্য ধর্ম থাকলেও তাঁর মধ্যে অতিরিক্তভাবে ঈশ্বরত্ব আছে। মরিসের মতে, মানুষের 'অপরিহার্য ধর্ম' এবং 'সাধারণ ধর্মের' মধ্যেও পার্থক্য আছে।[৩০] কোনও ধর্ম যদি মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়ার জন্য অপরিহার্য হয়, তাহলে সে ধর্মটি সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণ ধর্ম হিসেবেও উপস্থিত থাকবে। কিন্তু এর বিপরীতটা সত্য নয়, অর্থাৎ কোনও ধর্ম মানুষের সাধারণ ধর্ম হলেই যে সেই ধর্মটা মানুষের অপরিহার্য ধর্ম হবে তেমনটা নয়। সুতরাং কোনও ধর্ম 'সাধারণ ধর্ম' হলেও সেটা 'অপরিহার্য ধর্ম' নাও হতে পারে। যেমন, 'দুঃখ পরিহার করতে চাওয়া' প্রায় প্রত্যেক মানুষের সাধারণ ধর্ম, কিন্তু এই ধর্মটি মানুষের অপরিহার্য ধর্ম নয়। একইভাবে, মরিসের মতে, সসীম শক্তি, সসীম জ্ঞান ইত্যাদি ধর্ম 'নিছক মানুষের' সাধারণ ধর্ম হলেও, সেগুলি আবশ্যিক ভাবে 'সম্পূর্ণ মানুষের' অপরিহার্য ধর্ম নয়। সুতরাং, সাধারণ মানুষের মধ্যে উপস্থিত সমস্ত ধর্মই যে ঈশ্বরের অবতারের মধ্যেও থাকবে, তেমনটা নয়। অতএব, অবতারতত্ত্ব স্বীকার করলেই যে যৌক্তিক বিরোধ-বাধক নিয়মকে অস্বীকার করতে হবে এমনটা বলা যায় না। কিন্তু এই মতবাদের সমস্যা হল, 'সসীম শক্তি', 'সসীম জ্ঞান' যদি মানুষের অপরিহার্য গুণ বা ধর্ম না হয়, তাহলে এই গুণগুলি সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে কেন? আরও প্রশ্ন হল, যদি সমস্ত মানুষের মধ্যে কোনও গুণ সাধারণভাবে উপস্থিত

[৩০] Morris, V. Thomas. The Logic of God Incarnate. Ithaca. New York: Cornell University Press, 1986. p.88

থাকা সত্ত্বেও সেটা মানুষের অপরিহার্য গুণ বলে বিবেচিত না হয়, তাহলে 'অপরিহার্য' বলতে কী বোঝায়? মরিস এই সমস্ত প্রশ্নের কোনও সদর্থক উত্তর প্রদান করেননি।

দ্বিতীয়ত, কিছু দার্শনিক এমনটা মনে করেন যে, ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে 'যেভাবে' কোনও বিশেষ ধর্ম বা গুণ এবং সেই বিশেষ ধর্ম বা গুণের অভাব থাকে, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে 'যেভাবে' কোনও গুণ থাকে, ঠিক 'সেইভাবে' সেই গুণের অভাব থাকে না। যেমন, বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বরাবতারের মধ্যে যেভাবে 'অসীম শক্তি' গুণটি থাকে, ঠিক সেইভাবে তাঁর মধ্যে 'সসীম শক্তি' গুণটি থাকে না। ফলত, অবতারবাদ স্বীকার করলেও অবিরোধিতার নিয়ম লঙ্ঘিত হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, একটি আপেলের ছালের রঙের নিরিখে আপেলটির মধ্যে 'লালত্ব' আছে, আবার ঐ আপেলের ভিতরের সাদা অংশের নিরিখে আপেলটির মধ্যে 'লালত্বের অভাব' আছে। অর্থাৎ একটি আপেলের মধ্যে লালত্ব এবং লালত্বাভাব উভয় ধর্মই আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা মনে করি না যে, বিরোধ-বাধক নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়েছে। কেননা, আপেলের মধ্যে যেভাবে লালত্ব ধর্মটি আছে, ঠিক সেইভাবে কিন্তু লালত্বের অভাব ধর্মটি নেই। একইভাবে, ঈশ্বরাবতারের ক্ষেত্রেও আমরা এই যুক্তি প্রয়োগ করতে পারি। ঈশ্বরাবতারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরত্বের নিরিখে তাঁর মধ্যে অসীম শক্তি আছে এবং মানুষ হওয়ার নিরিখে তাঁর মধ্যে সসীম শক্তি আছে। সুতরাং ঈশ্বরাবতারের মধ্যে একই সময়ে একইভাবে অসীম শক্তি এবং তার বিরুদ্ধ ধর্ম সসীম শক্তি থাকে না। এই দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম বা গুণ ভিন্ন ভাবে ঈশ্বরাবতারের মধ্যে থাকে। ফলত, আমরা বলতে পারি না যে, অবতারতত্ত্ব স্বীকার করলে বিরোধ-বাধক নিয়মটিকে অস্বীকার করতে হবে।[৩১]

[৩১] Leftow, Brian. "A Timeless God Incarnate" in eds. Davis, Stephen T.; Kendall, Daniel, SJ; O'Collins, Gerald, S.J. eds. The Incarnation. Oxford: Oxford University Press, 1992. p.288

উপর্যুক্ত মতবাদ যেভাবে অবতারতত্ত্ব ও বিরোধ-বাধক নিয়মের মধ্যে সংহতি স্থাপনের চেষ্টা করেছে, তা স্বীকার করতে হলে আমাদের একথাও স্বীকার করতে হবে যে, ঈশ্বর ও তাঁর অবতারের স্বরূপের মধ্যে জলাভেদ্য পার্থক্য আছে। কিন্তু একথা মেনে নিলে, অবতারতত্ত্বের মূল বক্তব্য অর্থাৎ অবতারের মধ্যে একইসঙ্গে ঈশ্বরত্ব এবং মনুষ্যত্ব আছে তা অস্বীকার করতে হয়। এই জন্য ইলিয়োনোর স্টাম্প (Eleonore Stump), থমাস অ্যাকুইনাসকে (Thomas Aquinas, ১২২৫-১২৭৪) অনুসরণ করে 'প্রাপ্ত ধর্ম' (borrowed property)[৩২] নামক একটা তত্ত্ব দিয়েছেন। এই তত্ত্বটিকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি— বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' রচনাটি একই সঙ্গে কৌতুকপ্রদ এবং গুরুতর চিন্তাশীল রচনা। রচনাটির সার্বিক উদ্দেশ্যের নিরিখে সেটি গুরুতর চিন্তাশীল একটি রচনা। কিন্তু, কমলাকান্ত চক্রবর্তীর রসিকতার নিরিখে, 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' একটি কৌতুকপ্রদ রচনা। 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' রচনার 'কৌতুকপ্রদ' এবং 'গুরুতর চিন্তাশীল' এই দুটি আপাত অসঙ্গত ধর্ম আসলে 'প্রাপ্ত ধর্ম'—প্রথমটি রচনার সার্বিক উদ্দেশ্য থেকে প্রাপ্ত এবং দ্বিতীয়টি রচনার কেন্দ্রীয় চরিত্রের থেকে প্রাপ্ত। একইভাবে, ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী ধর্ম আমরা লক্ষ করি সেগুলি আসলে 'প্রাপ্ত ধর্ম'। যেমন অবতারের মধ্যে 'অসীম শক্তি' ধর্মটি তাঁর ঈশ্বরত্ব স্বরূপ থেকে প্রাপ্ত এবং 'সসীম শক্তি' ধর্মটি তাঁর মনুষ্যত্বের স্বরূপ থেকে প্রাপ্ত হয়েছে।

---

[৩২] Borrowing walks a fine line. On the one hand, if x borrows H from y, then x really has H-piggyback, so to speak ... If I cut my hand, then I really bleed ... I borrow the property of bleeding from my body, but I really bleed. But the fact that I am bleeding is none other than the fact that I am constituted by a body that is bleeding. So, not only does x really have H by borrowing it, but also_—and this is the other hand — if x borrows H from y, there are not two independent instances of H: if x borrows H, then x's having H is entirely a matter of having constitution elations to something that has H non-derivatively.
Stump, E. "Acquinas' Metaphysics of Incarnation". In D. K. Stephen T. Davis Ed., The Incarnation: An Interdisciplinary Symposium on the Incarnation of the Son of God. pp. 197-220. Oxford: Oxford University Press, 2020 p-205

ফলত, অবতারের এই দুটি ধর্ম 'প্রাপ্ত ধর্ম' হওয়ায় তারা একে অপরের সাথে অসঙ্গত নয়। সুতরাং, ঈশ্বরাবতারের সঙ্গে বিরোধ-বাধক নিয়মের কোনও অসঙ্গতি নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র যদিও বিশ্বাস করতেন যে কৃষ্ণ হলেন ঈশ্বরের অবতার তবুও *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণকে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ বলেই বর্ণনা করেছেন এবং কৃষ্ণ-কৃত কার্যাবলিকে একান্ত মানবোপম কার্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হলেও মানুষী শক্তি ভিন্ন তিনি অন্য কোনও শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেননি এবং মানুষী শক্তির দ্বারায় তিনি যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতেন। "প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতারস্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় মানবধর্ম্মাবলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই"।[৩৩] *বিষ্ণুপুরাণ* থেকেও বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি এই কথায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে কৃষ্ণ যে সমস্ত কর্ম করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে মানুষের ন্যায় কর্ম। *বিষ্ণুপুরাণ*-এ বলা হয়েছে,

মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।

...মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।

তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোহয়মুদ্যমবিস্তরঃ।

...মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ত্ততঃ।[৩৪]

অর্থাৎ জগদীশ্বর হলেও শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যধর্মশীল বলে এরূপ লীলা। যিনি সংকল্পমাত্রেই সৃষ্ট জগতের সংহার করতে পারেন। তবুও লীলাবশে মনুষ্যদেহধারীর অনুরূপ তাঁর ক্রিয়া।

---

[৩৩] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত". যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-১৮৮

[৩৪] *বিষ্ণুপুরাণ*, ৫/২২/১৪-১৮

মহাভারতে কৃষ্ণ সম্পর্কে যত অতিপ্রাকৃত কার্যের বিবরণ আছে সেগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র নানাভাবে ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেছেন যে হয় সেই ঘটনাগুলি প্রক্ষিপ্ত অথবা মানুষের পক্ষে সম্ভব বলেই কৃষ্ণ তা করতে পেরেছেন। এমনকি তিনি পাশ্চাত্য লেখকদের মন্তব্য উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে কৃষ্ণ তাঁর দৈবিক শক্তি ব্যবহার না করেই কেবল মানুষী শক্তি ব্যবহার করে কর্ম করতেন। ল্যাসেনের (Lassen) মতে,

> It is true that in the epic poems, both Rama and Krisna appear as incarnation of Visnu but they at the same time come before us as human heroes, and these two characters are so far for being inseparably blended together, that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted man- acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority.[৩৫]

[৩৫] Muir, J. Original Sanskrit Text on the Origin and History of The People of India. London: Trubner & Co., 1873. p.169

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্ম

ভারতীয় ধর্মনীতির সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ আলোচিত বিষয় হল ধর্ম। ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। ১৯ শতকের বৈশিষ্ট্য ছিল সবকিছুকে বুদ্ধির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা। ধর্ম কী তা বোঝার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। ধর্ম কী এমন কিছু যা কিনা নৈতিকতা অথবা বিজ্ঞান অথবা শিল্পকলার ওপর নির্ভরশীল বা ধর্ম কী এক প্রকারের দর্শন- এই প্রশ্নের উত্তর কান্ট (Kant, 1724-1804), হেগেল (Hegel, 1770-1831), ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold, 1822-88) প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ নানাভাবে দিয়ে গেছেন। ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ও ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রও এই বিষয়ে বিদগ্ধ চিন্তাভাবনা করেছেন।

ধর্মের উৎপত্তি

ধর্ম বলতে আমরা যাই বুঝি না কেন, একটা প্রশ্ন আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয় যে, ধর্ম কোথা থেকে উৎপন্ন হল? এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর পাওয়া যায়। অনেকের মতে এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। যেমন, একজন খৃষ্টান বলবেন যে, মুসা ও যিশু ধর্ম এনেছেন। মুসলমান বলবেন মহম্মদ, বৌদ্ধ বলবেন গৌতম বুদ্ধ ধর্ম এনেছেন। কিন্তু উক্ত ধর্মগুলি ছাড়াও পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাচীন জাতি আছে এবং তাদেরও ধর্ম আছে। কিন্তু সেই ধর্মের প্রবক্তা যিশু, মহম্মদ কিংবা বুদ্ধ নন। তাছাড়াও, যিশু কিংবা মহম্মদ কেউই ধর্মের প্রণেতা

নন, তাঁরা কেবলমাত্র প্রচলিত ধর্মের উন্নতি ও প্রচার করেছেন।[১] আদিম ধর্ম সমূহের কোনও প্রণেতা দেখা যায় না, বরং কিছু ধর্ম সংস্কারক দেখা যায়। বঙ্কিমের মতে, সৃষ্ট ধর্ম নেই, সকল ধর্মই পরম্পরাগত, কদাচিৎ বা সংস্কৃত।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, ঈশ্বর কর্তৃক ধর্ম উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীতে ধর্মের আগমণ ঘটেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে উক্ত প্রশ্নের এরূপ উত্তর গ্রহণীয় নয়। কেননা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রশ্ন হল—জীবের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে? এখন এই প্রশ্নের উত্তর যদি এইভাবে দেওয়া হয় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি হয়েছে, তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা আধুনিক সমাজে সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করবেন। সুতরাং, বঙ্কিমের মতে, জীব এবং ধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে 'ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট' যুক্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ধাঁচে ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক অনুসন্ধান হওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ধারা বলতে বঙ্কিম বুঝেছেন—কোনও বিষয়ের বিশেষ লক্ষণ দেখে সেই বিষয়ের সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করা। ধর্মের উৎপত্তি কবে হয়েছে এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু না বলা গেলেও, ধর্মের উৎপত্তির কিছু কারণ উল্লেখ করা যায়। এবং, সেই কারণ নির্দেশ করার জন্য আধুনিক সমাজের ধর্মের যে ধারণা প্রচলিত তা বিশ্লেষণ করলে চলবে না। তার জন্য প্রয়োজন আদিম সমাজের প্রচলিত ধর্মের বিশ্লেষণ।

---

[১] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৮০৫

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মূলত তিনটি কারণে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে—প্রথমত, পারলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস; দ্বিতীয়ত, জড় পদার্থে চৈতন্য আরোপ এবং তৃতীয়ত, দেবত্বের (বেশিরভাগই চৈতন্য আরোপিত জড় পদার্থ) উপাসনা। এই তিনটি কারণেরই ভিত্তি হল চৈতন্যের ধারণা। অর্থাৎ যেদিন থেকে মানুষ এটা বুঝতে শিখেছে যে, জীব বলতে কেবলমাত্র শরীরকে বোঝায় না। জীবের মধ্যে শরীর ছাড়াও 'জীবত্ব' থাকে - যাকে পরবর্তিকালে 'জীবন', 'প্রাণ' বা 'চেতনা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেদিন থেকে মানুষ চেতনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে সেদিন থেকে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের আবির্ভাব হয়েছে—যেমন, চেতনা কী, চেতনা কি শরীর অতিরিক্ত কোনও পদার্থ, কোন কোন পদার্থের চেতনা আছে ইত্যাদি। খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা করা, কথা বলা ইত্যাদি কর্ম করার প্রবৃত্তিই হল মানুষের মধ্যে অবস্থিত চেতনার লক্ষণ। যে পদার্থের মধ্যে প্রবৃত্তি লক্ষ করা যায়, সেই পদার্থ চেতন। এমন কী গাছেরও চেতনা বা জীবন আছে।

ধীরে ধীরে মানুষ বুঝতে শিখেছে যে, চেতনা শরীর অতিরিক্ত এক পদার্থ। কেনোনা, মৃত্যুর পর শরীর থাকলেও দেখা যায় চেতনা নেই, সুষুপ্তি অবস্থায় চেতনা থাকে না, এমন কী কারোর মূর্ছাদি রোগ হলে তার শরীর থাকলেও চেতনা থাকে না। ফলত, মানুষের মধ্যে আরও একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছিল যে, যদি চেতনা শরীর থেকে ভিন্ন হয় তাহলে, শরীর না থাকলে চৈতন্য থাকবে কিনা। মানুষের মধ্যে একপ্রকার বিশ্বাস জন্মাল যে শরীর না থাকলেও চেতনা অস্তিত্বশীল হতে পারে। এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে পারলৌকিক জীবনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস। বঙ্কিম মনে করেন যে, এই পারলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাসই ধর্মের উৎপত্তির প্রথম কারণ।

ধর্ম উৎপত্তির দ্বিতীয় কারণ হল জড় পদার্থে ওপর চৈতন্য আরোপ। আদিম মানুষের এই বিশ্বাস ছিল যে, যা কিছু আপন ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান হয় তাদের মধ্যেই চেতনা আছে। কিন্তু আদিম মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে ভ্রান্তি ছিল যে কোন পদার্থের চেতনা আছে এবং কোন পদার্থের চেতনা নেই। স্বাভাবিকভাবে, তারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর, যেমন বৃষ্টি, পাহার, বিদ্যুৎ, বায়ু, সূর্য্য ইত্যাদির ক্রিয়া দেখে তাদের ওপর চেতনা আরোপ করেছে। এখান থেকেই ধর্ম উৎপত্তির তৃতীয় কারণের আভাস পাওয়া যায়। আদিম মানুষ মনে করত যে যারা চৈতন্য বিশিষ্ট এবং অত্যন্ত শক্তিশালী তাদের তুষ্ট রাখতে পারলেই সর্বত্র মঙ্গল সাধিত হয়। অন্যথায়, এই চৈতন্য আরোপিত জড় পদার্থগুলির এত অসীম শক্তি আছে যে তারা রুষ্ট হলে সকলের অমঙ্গল হবে। ফলত মানুষের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হল এবং তারা বিভিন্ন শক্তিশালী চৈতন্য আরোপিত জড় পদার্থের উপাসনা করতে শুরু করে। কারণ উপাসনার দ্বারাই তাদেরকে তুষ্ট করা যায়। মূলত দুটি কারণে মানুষ উপাসনা করে। এক যে বস্তুর শক্তিতে আমরা ভীত তাকে আমরা উপাসনা করি এবং দুই যে বস্তুর মধ্যে ভয়দায়িকা শক্তি না থাকলেও শুধুমাত্র আমাদের হিতসাধন করে বলে আমরা তাদের উপাসনা করি। বঙ্কিমের মতে এই উপাসনা দ্বিবিধ—প্রথম প্রকার উপাসনার ক্ষেত্রে, অচেতন উপাস্য বস্তুকে সচেতন বলে উপাসনা করা, যেমন সূর্য, চন্দ্র, বায়ু ইত্যাদির উপাসনা এবং দ্বিতীয় প্রকার উপাসনার ক্ষেত্রে, অচেতন উপাস্য বস্তুকে অচেতন হিসাবেই উপাসনা করা হয়। অনুশীলনতত্ত্ব আলোচনার সময়ে আমরা দেখব যে, বঙ্কিমের মতে এই দ্বিতীয় প্রকার উপাসনায় হিতকর কেননা, এই উপাসনা কতকগুলি চিত্তবৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিণতিতে সাহায্য করে।

ধর্মের লক্ষণ ও স্বরূপ

এখন প্রশ্ন হল ধর্ম কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন,

> I am not one of those who thinks that a belief in God, or in a number of gods, or in a future existence, or anything else which does admit of proof, constitute religion. But when such belief, or any belief whatever, furnishes a basis for conduct- for the conduct of the individual towards himself as well as towards others, when by becoming a common faith and therefore furnishing a common basis of conduct, it becomes a bond of union between man and man, a standard by which human existence individual or aggregate, comes to be regulated, it is religion. This is very large definition, I admit. Religion, viewed thus, is in theory a philosophy of life; in practice it is a rule of life. It includes our beliefs, and the principle of our conduct founded upon those beliefs.[২]

অর্থাৎ, বঙ্কিমের মতে ধর্ম বলতে এক ঈশ্বর বা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসকে বোঝায় না, বরং ধর্ম হল যেকোনও বিশ্বাস যা কিনা ব্যক্তির নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি আচরণের ভিত্তি প্রদান করে। যখন একই সাধারণ বিশ্বাস ব্যক্তির আচরণের সাধারণ ভিত্তি প্রদান করে তখন মানুষের সাথে মানুষের বন্ধন দৃঢ় করে, এমন বন্ধন যা ব্যক্তি এবং সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাত্ত্বিক দিক থেকে ধর্ম হল জীবনের দর্শন কিন্তু ব্যাবহারিক দিক থেকে ধর্ম হল জীবনের রীতি-নীতি। ধর্মের এই লক্ষণকে বিচার করার জন্য তিনি উপযোগবাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একজন উপযোগবাদীর[৩] আচরণের নিয়ম হল 'সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ'। এই নীতিই তার আচরণের ভিত্তি। কিন্তু কেউ কখনও উপযোগবাদকে ধর্ম বলে চিহ্নিত

---

[২] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *Letters on Hinduism.* শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত. *বঙ্কিম-প্রতিভা.* কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস, ১৩৪৫. পৃষ্ঠা-16

[৩] মিল এবং বেন্থামের-এর উপযোগবাদ অনুসারে।

করেনি। তার কারণ কী উপযোগবাদী সর্বাধিক সুখের ওপর গুরুত্ব দেয় বলে? কিন্তু প্রশ্ন হল উপযোগবাদী কেন সুখের ওপর গুরুত্ব দেয়? কারণ তারা মনে করেন যে, সুখই হল সবকিছুর মাপকাঠি। তাই, উপযোগবাদকে যদি ধর্ম বলা হয় তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ধর্ম হবে না। কারণ, সুখই হল আচরণের মাপকাঠি বা ভিত্তি, সুখই হল পূজনীয় বিষয় এবং সুখই মানুষের আচরণের ও সমাজের নিয়ন্ত্রক। উপযোগবাদকে সম্পূর্ণ ধর্ম বলা যায় না, তার কারণ হল, উপযোগবাদীরা ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কেবলমাত্র সুখকেই গ্রহণ করেছেন—যা কিনা মানুষ ও সমাজের প্রকৃতির একটিমাত্র দিক। বঙ্কিমের মতে, সুখের ধারণার সাথে যদি সৌন্দর্য ও সত্যের ধারণা সংযুক্ত করা যায়, তাহলেই একটা সম্পূর্ণ ধর্ম পাওয়া সম্ভব।[৪] আর এর সাথে নৈতিকতা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সংযুক্ত করলে যা পাওয়া যাবে তাহল জীবনের সম্পূর্ণ পথপ্রদর্শক। আপত্তি হতে পারে যে এই ধরনের ব্যাখ্যা ধর্মের নয়, বরং অনুশীলনের ব্যাখ্যা। বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্ষেত্রে সিলিকে (John Robert Seeley 1834-95) অনুসরণ করে স্বীকার করেছেন—“the substance of Religion is Culture”।[৫]

ধর্মের এরকম ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষবাদীদের নিকট গ্রহণীয় হলেও, অতিপ্রকৃতিবাদিগণ এর বিরুদ্ধে আপত্তি করেন। তাদের মূল আপত্তি হল, যদি সুখ বা মঙ্গল, সৌন্দর্য ও সত্যের প্রতি ভক্তি সম্পূর্ণ ধর্ম গঠনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত হয় এবং তাকেই যদি প্রকৃত ধর্ম বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং তার দেবত্বের প্রতি বিশ্বাসের

---

[৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *Letters on Hinduism.* শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত. *বঙ্কিম-প্রতিভা.* কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস, ১৩৪৫. পৃষ্ঠা-17

[৫] ঐ. পৃষ্ঠা-17

কী ভূমিকা? এইরকম ধর্ম কল্পনা একপ্রকার নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয়, ঈশ্বরে ও তাঁর দেবত্বে ভক্তি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের আপত্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, ব্যক্তিগত ঈশ্বরে ভক্তিই হল ধর্মের সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা। একমাত্র ব্যক্তিগত ঈশ্বর মঙ্গল, সৌন্দর্য ও সত্যের সর্বোচ্চ এবং সম্পূর্ণ আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারে। সেই আদর্শের মাধ্যমেই মঙ্গল, সৌন্দর্য ও সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য এবং সামঞ্জস্য উপলব্ধ হয়।[৬] তাঁর মতে যদি ধর্ম বলতে অনুশীলন বোঝায় তাহলে এই আদর্শ হল তার উপলব্ধির গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সুতরাং, বঙ্কিমের মতে অতিপ্রকৃতিবাদ ধর্মের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তার দেবত্বে বিশ্বাস করতেন, তবুও তিনি এমনটা মনে করতেন না যে, যদি কোনও ধর্ম ঈশ্বর এবং তার দেবত্বের অস্তিত্ব স্বীকার না করে তাহলে তাকে ধর্ম বলা যাবে না, এমন কী তাকে অসম্পূর্ণ ধর্মও বলা যাবে না। তাঁর মতে এই ধরনের ধর্ম অপূর্ণ ধর্ম, যদিও আবশ্যিকভাবে তা অসম্পূর্ণ নাও হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ধর্মের দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য করেছেন—সম্পূর্ণ ধর্ম (complete religion) এবং পূর্ণ ধর্ম (perfect religion)। সম্পূর্ণতা এবং পূর্ণতার মধ্যে কোনও আবশ্যিক সম্বন্ধ নেই, এদের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্তমান তা প্রতিসম নয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণতা থাকলেই যে পূর্ণতা থাকবে—এমনটা কিন্তু নয়। সুতরাং কোনও ধর্ম অপূর্ণ হলেই যে তা অসম্পূর্ণ হবে তেমনটা নয়। কোনও ধর্ম অপূর্ণ হয়েও সম্পূর্ণ ধর্ম হতে পারে। কোনও কিছুর সম্পূর্ণতা নির্ভর করে যখন সেই বিষয়ের সমস্ত সাংগঠনিক অংশ গুলি উপস্থিত থাকবে, অন্যদিকে পূর্ণতা নির্ভর করে কোনও বিষয়ের সাংগঠনিক অংশ সমূহ ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট সমগ্রের

---

[৬] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *Letters on Hinduism.* শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত. *বঙ্কিম-প্রতিভা.* কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস, ১৩৪৫. পৃষ্ঠা-17

ওপর এবং সেই অংশ সমূহ যদি তাদের উৎপত্তির উদ্দেশ্য পরিপূরণে উপযুক্ত হয়। সম্পূর্ণতা নির্দেশ করে ঐক্যকে, আর পূর্ণতা নির্দেশ করে গুণকে। যেমন একটি রেজিমেন্ট সম্পূর্ণ হবে যখন তার মধ্যে পূর্ণ সংখ্যক সৈন্য থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা অপূর্ণ হতে পারে যদি যুদ্ধ করার পর্যাপ্ত গুণাবলী না থাকে।[৭]

সুতরাং বঙ্কিমের মতে ধর্ম হল জীবনের দর্শন এবং তার থেকে প্রবাহিত আচরণের নিয়ম সমূহ। কোনও পরিস্থিতিতে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যা করা হয়, তাই হল আচরণ। অর্থাৎ আচরণ হল নিয়ম সমূহের ফলাফল। আচরণ ও তার নিয়মের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। তাঁর মতে যথার্থ আচরণের নিয়মের প্রয়োগ অযথার্থ হতে পারে। আচরণের নিয়ম যথার্থ বা সঠিক হলেও, তার প্রয়োগ যদি অযথার্থ বা ভ্রান্ত হয় তাহলে আচরণও অযথার্থ বা ভ্রান্ত হবে। এই ক্ষেত্রে আচরণের যে নিয়ম প্রযুক্ত হয়েছে তাতে কোনও খুঁত থাকে না, খুঁত থাকে ঐ আচরণের নিয়ম সম্বন্ধে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বা বিচার এবং তার প্রয়োগে। এখানে লক্ষণীয় বঙ্কিম তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে ধর্মের আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত বিচার প্রচলিত, তা আসলে ধর্মের তাত্ত্বিক অংশের দোষ নয়, বরং ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের প্রয়োগের দোষ। যদি ভ্রান্ত এবং খারাপ আচরণের জন্য সেই আচরণের নিয়ম-নীতিকে দুষ্ট বলে স্বীকার করা হয় তাহলে এই কথাও স্বীকার করতে হবে সেই আচরণের নিয়মটি প্রকৃত পক্ষে অযথার্থ। যেমন আমরা এমনটা বলতে পারি না যে, সমস্ত যুদ্ধ, গণহত্যা, নরহত্যার জন্য খৃষ্টান নীতিই দায়ী। একই বিষয়

---

[৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *Letters on Hinduism.* শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত. *বঙ্কিম-প্রতিভা.* কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস, ১৩৪৫. পৃষ্ঠা-18

হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে বঙ্কিম মনে করতেন। তাঁর মতে, হিন্দুধর্মের আবশ্যিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণার নিরিখেই পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ হিন্দুধর্মকে দোষারোপ করেছে এবং বিচার করেছে। ক্রুসেড, রোমান ক্যাথোলিক ও ইহুদিদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্য যদি খৃষ্টান নীতি দায়ী না হয়, তাহলে সতীদাহ প্রথা, জাতপাত ইত্যাদির জন্যও হিন্দুধর্মের নিয়ম-নীতিকে দায়ী করা বাঞ্ছনীয় নয়।[৮] হিন্দুধর্মের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা বশত এই সমস্ত কু-প্রথার উদ্ভব হয়েছে। ফলত, এই সমস্ত কু-প্রথার জন্য হিন্দুধর্মকে তুচ্ছ করে দেখার কোনও কারণ নেই। আসলে এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তা হল, বিভিন্ন ধর্মের বিচারের মাপকাঠি কী হবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বিচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি গ্রহণ করা উচিত নয়। তাঁর মতে ইউরোপীয় সমালোচকগণ হিন্দুধর্ম বিচারের ক্ষেত্রে এই ভুল করেছেন। সুতরাং ধর্মের বিচারের ক্ষেত্রে ধর্মের যে ভিত্তি অর্থাৎ রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন ইত্যাদির তাত্ত্বিক অংশের সাথে তাদের প্রয়োগের যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেই বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বঙ্কিমের মতে, ধর্ম বলতে বোঝায় কিছু নীতির সমাহার, তেমনি কিছু মৌলিক নীতির সমাহার হল হিন্দুধর্ম। এই মৌলিক নীতিগুলি হিন্দুর তাত্ত্বিক বিশ্বাস ও হিন্দুর বাস্তব জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি প্রদান করে। যে নীতি গুলি হিন্দুর বাস্তব জীবনের ভিত্তি প্রস্তুত করতে সহায়তা করে, সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে হিন্দু নৈতিকতা, হিন্দু দর্শন, হিন্দু বিধান

---

[৮] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *Letters on Hinduism.* শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত. *বঙ্কিম-প্রতিভা.* কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস, ১৩৪৫. পৃষ্ঠা-19

এবং হিন্দু বিধিবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা। এগুলি সবই হিন্দু নীতির প্রায়োগিক দিক। যদি চূড়ান্ত হিন্দু নীতি সত্য ও যথার্থ প্রমাণিত হয় তাহলে সেই নীতির ভ্রান্ত ও অযথার্থ প্রয়োগকে বাতিল করতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়েই ধর্মীয় সংস্কার সম্ভব।[৯]

বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের একটা নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। এই বিষয়ে *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "তাই আমি এই ধর্ম্মব্যাখ্যায় যত পারি, পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্ম্মের মন্দির গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম্ম ভিত্তিশূন্য হইল না"।[১০]

ভারতীয় ধর্মনীতির ক্ষেত্রে 'ধর্ম' শব্দটি হল সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর, অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। ভারতীয় ধর্মনীতির অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে 'ধর্ম' শব্দের এই অস্পষ্টতা। আলোচনা ও পরিস্থিতির নিরিখে বিভিন্ন স্থলে 'ধর্ম' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তার মূল কারণ হল 'ধর্ম' শব্দের এই নানার্থকতা। এক স্থলে ধর্ম অর্থে এক অর্থ গ্রহণ করে অন্য স্থলে অন্যার্থ গ্রহণ করার জন্যই যত সমস্যার উৎপত্তি হয়। তাঁর মতে, *মনুস্মৃতি*-র প্রথম অধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোকে 'ধর্ম' শব্দটি এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "ধর্ম্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্ম্মাত্মতার প্রতি, এবং কখন

---

[৯] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *Letters on Hinduism.* শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত. *বঙ্কিম-প্রতিভা.* কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস, ১৩৪৫. পৃষ্ঠা-19

[১০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬০২

পুণ্যকর্ম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে – নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্ম্মে, কর্ম্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত হওয়াতে একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্ম (রিলিজন) – উপধর্ম্মসঙ্কুল, নীতি – ভ্রান্ত, অভ্যাস – কঠিন, এবং পুণ্য – দুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল"।[১১] অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলালের মতে,

> Dharma is an intelligible concept on its home ground, in spite of all ubiquity, ambiguity and multivalent character. It makes sense in relation to other interrelated concepts, such as artha, karma, dukkha, kavya and rasa. In various contexts, the word dharma may mean: law, justice, custom, morality, ethics, religion, duty, nature or virtue. Yet it is not usually regarded as homonym.[১২]

অর্থাৎ ধর্ম শব্দের কোনও একটি নির্দিষ্ট অর্থ নেই, 'ধর্ম' শব্দ অনেকার্থক। এবং সেই কারণেই অধ্যাপক মতিলালের মতে, যদিও 'ধর্ম' শব্দটি সর্বব্যাপী এবং অস্পষ্ট, তবুও এই শব্দটি তার নিজস্ব ক্ষেত্রেই একমাত্র বোধগম্য হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থের ক্রোড়পত্র 'ক'-এ 'ধর্ম'-এর ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের উল্লেখ করেছেন। প্রথম, ইংরেজ যাকে রিলিজিয়ন বলে, তাকে ভারতে ধর্ম বলা হয়। যেমন- হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি। দ্বিতীয়, পাশ্চাত্যে যাকে 'মর‍্যালিটি' বলা হয় প্রাচ্যে তাকে ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়।

---

[১১] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৭২

[১২] Ganeri, Jonardon. *Ethics and Epics: The Collected Essays of Bimal Krishna Matilal*. Ed. Jonardon Ganeri. Vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 2002, p.36

যেমন- কোনও কাজ ধর্ম বিরুদ্ধ- একে নীতিও বলা হয়। তৃতীয়, 'ধর্ম' শব্দে ভারচু (virtue) বোঝানো হয়। চতুর্থ, রিলিজিয়ন বা নীতির অনুমোদিত কাজকে ধর্ম বলা হয়, তার বিপরীতকে বলে অধর্ম। পঞ্চম, 'ধর্ম' শব্দে গুণ বোঝায়। যেমন- চৌম্বকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ এবং ষষ্ঠ, 'ধর্ম' শব্দ কখনও কখনও আচার বা ব্যবহার্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন- দেশধর্ম, জাতিধর্ম ইত্যাদি।[১৩] ধর্ম ও রিলিজিয়নের সম্পর্ক বিষয়ে বলতে গিয়ে ড. সুচরিতা দে বলেছেন, "Bankim Chandra uses the Sanskrit word 'Dharma' as synonym of Religion''.[১৪] অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম' ও 'রিলিজিয়ন'-কে সমার্থক বলে মনে করতেন। কিন্তু বঙ্কিম কখনও ধর্ম ও রিলিজিয়নকে সমার্থক বলে মনে করেননি। তাঁর মতে রিলিজিয়ন হল ধর্মের একটি অংশমাত্র। 'ধর্ম'-কে যদি সমগ্র রূপে দেখা হয় তাহলে 'রিলিজিয়ন', 'নৈতিকতা' ইত্যাদি তার অংশমাত্র হবে। রিলিজিয়ন বা নৈতিকতার থেকে ধর্মের পরিধি অনেক ব্যাপক।

'ধর্ম' শব্দটির বুৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে—যার অর্থ হল 'ধারণ করা'। ধর্ম সৎ, চিৎ এবং আনন্দকে ধারণ করে, তথা ধর্ম মানুষ এবং সমাজকে ধারণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'মানুষের ধর্ম' কথাটি ব্যবহার করেছেন তখন তিনি ধর্ম বলতে মানুষের রিলিজিয়নকে বোঝাতে চাননি। সেক্ষেত্রে তিনি ধর্ম বলতে মানুষের গুণের কথা বলেছেন। সেখানে তার বক্তব্য হল, যার অধিকারী হলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে এবং যা না থাকলে

---

[১৩] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৭১

[১৪] Dey, Dr Sucharita. *Vivekananda and Bankimchandra on Religon*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander, 2004. p.100

মানুষ কে মানুষ বলা যায় না, সেই মনুষ্যত্বই হল 'মানুষের ধর্ম'। চৌম্বকের ধর্ম যেমন লৌহকর্ষণ, অগ্নির ধর্ম যেমন দাহকতা, তেমনি মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। বঙ্কিমের ভাষায়, "যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম"।[১৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সংস্কৃত শব্দ 'ধর্ম' অর্থে ইংরাজি 'রিলিজিয়ন' শব্দকে বুঝেছিলেন। 'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'সম্পর্কের নীতি' যা আমাদের দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখে এবং পরিভাষাগত অর্থ হল কোনও বস্তুর অপরিহার্য গুণ বা স্বরূপ । যেমন অগ্নির অপরিহার্য গুণ হল দহন।[১৬] রাধাকৃষ্ণান এর মতে,

> Dharma is an elastic tissue which cloths the growing body. If it is too tight it will give way, and we shall have lawlessness, anarchy and revolution. If it is too loose it will trip us and impede our movement. It should not be too far behind, or too far ahead of, intelligent public opinion.[১৭]

অর্থাৎ, ধর্ম একটি স্থিতিস্থাপক টিস্যুর ন্যায় যা ক্রমবর্ধমান শরীরকে আচ্ছাদিত করে রাখে। যদি এটা খুব আঁটসাঁট বা নিবিড় হয় তাহলে এটা আমাদের মধ্যে অরাজকতা, অনাচার ও বিপ্লবের পথ প্রশস্থ করবে। আর এটা যদি অত্যন্ত শ্লথ বা শিথিল হয় তাহলে এটা আমদের ভুল পথে পরিচালিত করবে এবং আমাদের গতিপথকে রুদ্ধ করবে। ধর্ম যেন বুদ্ধিদীপ্ত জনমতের খুব বেশি পিছনেও না থাকে, আবার খুব বেশি এগিয়েও না থাকে। ধর্মের এরূপ ব্যাখ্যা আসলে মানব সমাজের সংশোধনের প্রসঙ্গকে উল্লেখ করে।

---

[১৫] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৭৭৮

[১৬] See, Tagore, Rabindranath. *The Religion of Man*. London: George Allen and Unwin Ltd, 1931.

[১৭] Radhakrishnan, S. *Religion and Society*. Harper Collins Publishers India Pvt. Ltd, 1997 (1st Published 1947). p-119

প্রত্যক্ষবাদী, অগস্ত কোঁতে, সেন্ট সিমন প্রমুখের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানব সমাজ সংস্কার। এই চিন্তাবিদদের মৌলিক চিন্তার বিষয় ছিল সমাজ সংস্কার বিষয়ে তত্ত্বালোচনা নয়, বরং সমাজ সংস্কারের বাস্তবতা। যদিও বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে একপ্রকার সার্বিক সুখ এসেছে, তবুও রাজনৈতিক বিপ্লব সার্বিক মানব অধিকারের দ্বারাও নীচু শ্রেণির দুর্দশা এবং অজ্ঞতাকে দূর করতে পারেনি। সুতরাং রাজনৈতিক বিপ্লবের পথ ধরে মানব সমাজের সংস্কার সম্ভব নয়। আম্বেদকরের মতেও রাজনৈতিক সংস্কারের আগে সামাজিক সংস্কার প্রয়োজন। একমাত্র তখনই দলিত শ্রেণির দুর্দশা নিবৃত্ত করা সম্ভব।[১৮] সেই কারণে প্রয়োজন সামাজিক বিবর্তন—যা আসবে শিক্ষা এবং জ্ঞানের দ্বারা সমাজের ক্রমশ সংস্কারের মাধ্যমে।

বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করতেন ধর্ম পালনের জন্য প্রয়োজন সমাজ। সমাজই হল ব্যক্তির উৎকর্ষ ও উন্নতির ভিত্তি। সমাজের ধ্বংস মানেই হল ধর্মের বিনাশ। তাই সর্বাগ্রে সমাজ রক্ষা কর্তব্য। সমাজের ধ্বংসের ফল যেমন ধর্মের বিনাশ তেমনি ধর্ম শূন্য সমাজেরও উন্নতি অসম্ভব এবং বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর নিজের ভাষায়, "যে সমাজ ধর্ম্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী"।[১৯] এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট স্পেন্সারের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে, "the life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its

---

[১৮] দ্রষ্টব্য Ambedkar, Dr. B. R. Annihilation of Caste. Amritsar: The Ambedkar School of Thought, 1936

[১৯] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৭৭৮

units."[২০] স্পেন্সারের ওপর কোঁতের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সমাজ সংক্রান্ত স্পেন্সারের এই চিন্তার বীজ কিন্তু লুকিয়ে ছিল কোঁতের সমাজ-ধর্ম-চিন্তার মধ্যেই। কোঁতের মতে,

> Religion in itself expresses the state of perfect unity which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical are made habitually to converge to one common purpose.[২১]

অর্থাৎ ধর্ম বা রিলিজিয়ন নিজেই একধরনের পূর্ণ ঐক্যের অবস্থা প্রকাশ করে, যা মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং পৃথকভাবে সমাজগত অস্তিত্বের স্বকীয় চিহ্ন স্বরূপ, যখন ব্যক্তির নৈতিক ও শারীরিক সমস্ত প্রকৃতি একটিমাত্র সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য অভ্যাসগত একই বিন্দুতে মিলিত হয়। কোঁতের মতে আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে আমাদের বিষয়ীগত বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করতে পারলেও, জাতির সমগ্রতার মধ্যে যে সাধারণ বিষয়িগত বৈশিষ্ট্য আছে তার ঊর্ধ্বে আমরা কখনও নিজেদের নিয়ে যেতে পারি না। এরূপ চিন্তা থেকেই কোঁত তাঁর 'মানবতার ধর্ম' (Religion of Humanity) তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। 'মানবতার ধর্ম' হল একটি নিরীশ্বরবাদী তত্ত্ব, এই তত্ত্বেও মূল বক্তব্যই হল বাহ্য ঈশ্বরের উপাসনা নয়, বরং মানবতার উপাসনা করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মত হল যে, রিলিজিয়ন সম্পর্কে কোঁতের মতই অন্যান্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ মত এবং তিনি নিজেও কোঁতের চিন্তার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কোঁতের কাছে 'মানবতা' নিরীশ্বর হলেও, বঙ্কিমের 'মানবতা' কিন্তু নিরীশ্বর নয়। কারণ, বঙ্কিমের কাছে ধর্ম ও রিলিজিয়নের বিচার ও

---

[২০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৬০

[২১] ঐ, পৃষ্ঠা-৬৭৬

আলোচনা ঈশ্বর ভিন্ন হতে পারে না। তাঁর নিজের ভাষায়, "যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি"।[২২] এরূপ বক্তব্যের কারণ এই যে, বঙ্কিমের মতে হিন্দুদের রন্ধে রন্ধে ভক্তি বা উপাসনা উপস্থিত। ফলত, তাঁর মতে রিলিজিয়ন বা ধর্ম থেকে ঈশ্বরকে বিযুক্ত করে আলোচনা করা ব্যর্থ। ঈশ্বর সম্বন্ধে বঙ্কিমের আরও বক্তব্য হল,

> The third answer seeks to reconcile the other two. It grants that there may be a first cause, and it admits nature and her laws, if not exactly to be self-existent, but what very nearly amounts to the same thing. Granted, there is a first cause, but why should we seek it beyond nature? Is it impossible that the cause of the universe should be in itself? God, it says, is in Nature; and all phenomena his manifestation. This is pantheism.[২৩]

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বর হলেন পরম সত্তা। আর জি কলিংউড-এর মতে,

> If philosophy is the theory of the universe, what is religion? ...It was the theory of God, and of God's relations to the world and man. But the latter is surely nothing more or less than a view of the universe. Indeed religion is quite as comprehensive as philosophy. For the religious consciousness in its true and complete form nothing is irrelevant, nothing is without its own

---

[২২] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬০৫

[২৩] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *Letters on Hinduism.* শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত. *বঙ্কিম-প্রতিভা.* কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস, ১৩৪৫. পৃষ্ঠা-59

> unique and individual value. Religion and philosophy alike are views of the universe.[২৪]

অর্থাৎ ধর্ম হল ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্ব এবং জগৎ ও মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব। দর্শনকে যদি জগৎ বিষয়ক তত্ত্ব বলা হয়, তাহলে ধর্মকেও জগৎ বিষয়ক তত্ত্ব বলে বিবেচনা করতে হয়। কেননা, ঈশ্বরের সাথে জগৎ ও মানুষের সম্পর্ক জগৎ বিষয়ক তত্ত্বেরই সূচনা করে।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কে দুধরনের ধারণা প্রচলিত আছে – ঈশ্বর হয় সগুণ অথবা নির্গুণ। কিছু ভারতীয় দার্শনিকের মতে ঈশ্বরের কোনও গুণ স্বীকার করা যায় না। যেহেতু ঈশ্বর পূর্ণ ও অসীম সত্তা, তাই তাঁর কোনও গুণ থাকতে পারে না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গুণ স্বীকার করলে ঈশ্বরকে আর অসীম বলা যাবে না। কারণ নিজের গুণের দ্বারা ঈশ্বর সসীম হয়ে পড়বেন। তাই তারা ঈশ্বরকে নির্গুণ ব্রহ্ম রূপে কল্পনা করেছেন। নির্গুন ব্রহ্মের কোনও উপাসনা সম্ভব নয়, যেহেতু তাঁর কোনও গুণ নেই। যে ঈশ্বরের কোনও গুণ নেই, তার সাথে জীবের সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায় না। ফলত, নির্গুন ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করাও অসম্ভব। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অনন্ত গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের প্রতি যার ভক্তি আছে, একমাত্র সেই ব্যক্তি ভক্ত হতে পারে। অতএব সগুণ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ভক্তির এবং উপাসনার প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক। নির্গুণ ব্রহ্মের ক্ষেত্রে নয়। *বেদান্তসার* গ্রন্থে উল্লেখ

[২৪] Collingwood, R. G. Religion and Philosophy. Ed. David Pierce. Istanbul: Mimar Sinam Guzel Sanat University, 2015. p.44

আছে যে, শান্ডিল্যই এই সগুণ ঈশ্বর তত্ত্বের প্রবক্তা। এই সগুণ ঈশ্বরের ধারণা থেকেই ভক্তিতত্ত্বের উৎপত্তি।[২৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "ঈশ্বর সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এই জন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে, ধর্ম্ম সম্যক্ ধর্ম্মত্ত্ব প্রাপ্ত হয় না...। অদ্বৈতবাদিদিগের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য অথবা যাহাকে হার্বার্ট স্পেন্সার "Inscrutable Power in Nature" বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি কেবন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। ...সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্ম্মের মূল, কেন না, তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে "Impersonal God" বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল; যাঁহাকে "Personal God" বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল"।[২৬]

অনুশীলনতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মের ধারণার ব্যাপকতা অনুধাবন করা যায়, যখন তিনি বলেন বিজ্ঞানও ধর্ম। বিজ্ঞান যেমন উন্নতিতে সাহায্য করে, তেমনি ধর্মও সমস্ত সামাজিক উন্নতির কারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যখন কোনও বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের গরিমার কথা বলে এবং যখন কোনও ভক্ত 'হরি' নাম উচ্চারণ করে – এই দুটিই একই বিষয়ের দ্যোতক। ধর্ম, তাঁর মতে, আনন্দ বা সুখের উপায় । ধর্ম হল নিত্য। ধর্মের ফল ইহজগৎ ও পরকাল উভয় জগতেই সুখ বা আনন্দ। তিনি লিখেছেন, "ধর্ম্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকাল থাকে, তবে

---

[২৫] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬২৫

[২৬] ঐ, পৃষ্ঠা-৫৯৩

পরকালেও সুখ। ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই”।[২৭] তাঁর মতে, যে ব্যক্তির সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, সেই ব্যক্তি যথার্থ সুখের অধিকারী। যার সমস্ত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি তার মুক্তি সম্ভব নয়, যেহেতু সে অজ্ঞ, অসমর্থ বা অযোগ্য, তার হৃদয় ও মন কলুষিত ও তমসাচ্ছন্ন। বঙ্কিমের কাছে কিন্তু সুখ বা আনন্দ অপরিশীলিত সংবেদনের বিষয় নয়। সুখ আহরণের মৌলিক নিয়মই হল শারীরিক ও মানসিক সমস্ত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটানো এবং সেগুলিকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়জিত করা—যা হল ভক্তি।

সুতরাং, লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমের মতে মনুষ্য প্রকৃতির সারধর্ম হল সুখ প্রাপ্তি এবং সুখ প্রাপ্তির উপায় হল সমস্ত বৃত্তির বিকাশ। এই স্থলে আমাদের বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব আলোচনা করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল অনুশীলনতত্ত্ব। অনুশীলনতত্ত্বের মূল বিষয় হল, প্রথম, ব্যক্তি বা মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে, যাকে বৃত্তি বলা হয় এবং সেই শক্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। দ্বিতীয়- মনুষ্যত্বই হল মানুষের ধর্ম। তৃতীয়, বৃত্তিগুলির পারস্পরিক সামঞ্জস্য হল অনুশীলনের সীমা। চতুর্থ, বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনের ফল হল সুখ। পঞ্চম, এই সমস্ত বৃত্তিগুলির অনুশীলন যখন ঈশ্বরমুখী হয় সেই অবস্থাকে ভক্তি বলে। ষষ্ঠ, সর্বভূতের প্রতি প্রীতিই হল ভক্তি, মনুষ্যত্ব ও ধর্মের সোপান। সপ্তম, স্বদেশপ্রীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।[২৮] তিনি মানুষের বৃত্তি সমূহকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—শারীরিক বৃত্তি, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি—যেগুলির কাজ হল

---

[২৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৮৯

[২৮] ঐ, পৃষ্ঠা-৬৭১

জ্ঞান আহরণ করা, কার্য্যকারিণী বৃত্তি—যেগুলির কাজ হল কর্মে প্রবৃত্ত করা এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি—এইগুলি জ্ঞান আহরণ করে না এবং কর্মে প্রবৃত্ত করতে সহায়তাও করে না, এগুলির কাজ হল আনন্দ অনুভব করা।[২৯] তাঁর মতে এই সমস্ত বৃত্তির যথার্থ অনুশীলন ও পারস্পরিক সামঞ্জস্যই হল প্রকৃত মনুষ্যত্ব—এটাই ধর্ম। অর্থাৎ প্রকৃত মানবধর্ম নির্ভর করে অনুশীলনের ওপরে। *রিপাবলিক* (*Republic*) গ্রন্থে প্লেটোর যে 'শিক্ষা তত্ত্ব' পাওয়া যায় সেখানে প্লেটোও বলেছেন প্রকৃত মানবধর্মের নীতিটি ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে এবং সঙ্গীতের দ্বারা মনকে প্রশিক্ষণের ওপরে নির্ভরশীল।[৩০] বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্বে তাই শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলির অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে। কারণ বঙ্কিমের মতে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের প্রয়োজন। সামগ্রিক বিকাশ না ঘটলে ব্যক্তি কখনও তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না—অর্থাৎ মানবধর্মের যে উদ্দেশ্য, সেই সুখ প্রাপ্তি তার হবে না।

সমগ্র ভারতীয় ধর্মনীতিতেই আমরা দেখি মুক্তির ক্ষেত্রে শারীরিক বিকাশের থেকে মানসিক বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শরীরকে ভারতীয় দার্শনিকগণ মুক্তির অন্তরায় বলে মনে করে। অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ বলে আলোচনা করলেও, মুক্তির ক্ষেত্রে এই দুটি পুরুষার্থের কোনও প্রত্যক্ষ মূল্য স্বীকার করা হয় না। এমনকি এগুলি ততক্ষণই পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হবে যতক্ষণ এগুলি ধর্মের দ্বারা অনুশাসিত থাকবে। ভারতীয় ধর্মনীতিতে

---

[২৯] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৯৫

[৩০] Dey, Dr Sucharita. *Vivekananda and Bankimchandra on Religion*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander, 2004. p.100

অর্থ এবং কামের যে গুরুত্ব আছে তা কেবলমাত্র জীবন রক্ষা এবং সমাজ রক্ষার তাগিদে। কিন্তু জীবনের যে পরম লক্ষ্য অর্থাৎ মুক্তি সেক্ষেত্রে এগুলির কোনও ভূমিকা স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু বঙ্কিমের কাছে, কেবলমাত্র যে জীবন রক্ষা ও সমাজ রক্ষার জন্য শারীরিক বৃত্তিগুলির অনুশীলন প্রয়োজন তা নয়, শারীরিক বৃত্তিগুলি প্রত্যক্ষভাবে মুক্তির সঙ্গেও যুক্ত। কারণ শারীরিক বৃত্তিগুলির যদি প্রস্ফুরণ না ঘটে তাহলে ঈশ্বর উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি সম্ভব হবে না–ফলত ধর্মের ফল যে সুখ-প্রাপ্তি তা সম্ভব হবে না। এই সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন, “ যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজন। ...ইহা কোন ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্ম্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে”।[৩১]

শারীরিক বৃত্তিগুলির ন্যায় অন্যান্য মানসিক বৃত্তিগুলির ও অনুশীলন প্রয়োজন। তবে বিভিন্ন বৃত্তি গুলির মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন হওয়া উচিত। যে অবস্থায় সকল বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্তি ও পরিণতি লাভ করে তাকেই সামঞ্জস্য বলে। তবে সকল বৃত্তির সমপরিমাণ স্ফূর্তির কথা কিন্তু বঙ্কিম বলেননি। কারণ মানসিক বৃত্তির তুলনায় শারীরিক বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণ শক্তি অধিক। সেক্ষেত্রে যদি শারীরিক বৃত্তির সম্পূর্ণ ও বাঁধন ছাড়া

---

[৩১] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী,* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬০৭

স্ফূর্তির স্বীকৃত হয় তাহলে অন্যান্য মানসিক বৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে না। ফলত, বঙ্কিমের মতে, কিছু নিকৃষ্ট বৃত্তি আছে সেগুলির দমনই সমুচিত স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যের অপ্রতিবন্ধক। যেমন—রাগ, ক্রোধ, কাম ইত্যাদি শক্তিগুলি স্বাভাবিকভাবেই অধিক সম্প্রসারিত হয় এবং এগুলির অধিক সম্প্রসারণ অন্যান্য মানসিক বৃত্তি যথা- ভক্তি, দয়া, প্রীতি ইত্যাদির অনুশীলনে বিঘ্ন ঘটায়। তাই নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও বৃত্তিগুলির পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ফূর্তি ও পরিণতির জন্য তাদের দমনই কর্তব্য। তবে বঙ্কিমচন্দ্র 'দমন' অর্থে বিনাশ বা ধ্বংসকে বোঝেননি। কারণ এদের যদি ধ্বংস বা বিনাশ করা হয় তাহলে, জীবনরক্ষা ও সমাজরক্ষা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, "হিন্দুশাস্ত্রানুসারেও পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্ম্মের অংশ। তবে ধর্ম্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি, তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ — এবং তদনুগামী এই ধর্ম্মব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যে স্ফূর্ত্তি, তাহা সামঞ্জস্যের বিঘ্নকর, এবং উচ্চতর বৃত্তি সকলের স্ফূর্তিরোধক। যদি অনুচিত স্ফূর্ত্তিরোধককে দমন বলে, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয় দমনই পরম ধর্ম্ম"।[৩২] বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু কোনও অবস্থাতেই নিকৃষ্ট বৃত্তির বিনাশ চান না। কারণ, তিনি মুক্তির ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদের নিবৃত্তিমার্গকে স্বীকার করেননি। সন্ন্যাসধর্মে এই সমস্ত নিকৃষ্ট বৃত্তির বিনাশের কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে নিবৃত্তিমার্গের দ্বারা মুক্তি সম্ভব নয়, মুক্তির ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিমার্গই প্রয়োজন। কারণ নিবৃত্তিমার্গ কর্মকে উপেক্ষা করে। কিন্তু বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মের ভিত্তি

---

[৩২] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৯৭

হল *ভগবদ্গীতা,* যেখানে কর্মের গুরুত্বের ওপর প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে। যেহেতু সন্ন্যাসধর্ম কর্মাত্মক নয়, সেহেতু বঙ্কিম সন্ন্যাসধর্মকে অপূর্ণ ধর্ম বলেছেন।[৩৩] এখান থেকে আরও একটি বিষয় সম্পর্কে বঙ্কিমের ভাবনা কী তা স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়—বঙ্কিমের মতে কেবলমাত্র জ্ঞানমার্গের দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় না।

শারীরিক বৃত্তি সমূহের অনুশীলনের ফল হল শারীরিক সর্বাঙ্গীন বিকাশ। তেমনি, মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ফল হল সচ্চিদানন্দ। জানার্জ্জনী বৃত্তির ফল হল জ্ঞান, কার্যকারিণী বৃত্তির ফল হল কর্ম এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির ফল আনন্দ। বঙ্কিমের মতে অনুশীলনের ফল হল ধর্ম এবং ধর্মের ফল হল সুখ-প্রাপ্তি। সুতরাং মানব জীবনের লক্ষ্য হল সুখ আহরণ করা। অ্যারিস্টটলের মতেও ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য নিজের সুখ বা আনন্দ। তাঁর মতে, "for we choose happiness for itself, and never with a view to anything further; whereas we choose honor, pleasure intellect…because we believe that through them we shall be made happy."[৩৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমের মতে, যে অবস্থায় মানুষের সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বাঙ্গীন পরিণতি হয় তাকে 'মনুষ্যত্ব' বলে – এবং এই প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে বঙ্কিম প্রকৃত চরিত্রবান মানুষ (virtuous man) বলেছেন। তাঁর মতে, সর্বভূতে প্রীতি, দয়া ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এই মনুষ্যত্বের বিশেষত্ব। বঙ্কিমের এই চরিত্রবান মানুষের যে ধারণা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সাথে অ্যারিস্টটলের চরিত্রবান মানুষের ধারণার সাদৃশ্য আছে। অ্যারিস্টটলের মতে –

[৩৩] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬০০

[৩৪] Aristotle. Nicomachean Ethics. Trans. W D Ross. 350 BC. I, 7

> The virtuous man will act often in the interest of his friends and of his country, and if need be, will even die for them…would rather perform one noble and lofty action than many poor actions. This is true of one who lays down his life for another; he chooses great nobleness for his own.[৩৫]

অর্থাৎ চরিত্রবান ব্যক্তি প্রায়শই দেশের জন্য এবং বন্ধুদের জন্য কর্ম করে, এমনকি প্রয়োজনে সে তাদের জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগও করতে পারেন। চরিত্রবান ব্যক্তি বা মানুষ অনেক মন্দ কাজের তুলনায় একটি অভিজাত ও মহান কর্ম করে থাকেন। এটা তাদের ক্ষেত্রে সত্য যারা অন্যের জন্য আত্মদান করেন; তিনি নিজের জন্য মহত্তকে বেছে নেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বারংবার তাঁর বিভিন্ন রচনাতে উল্লেখে করেছেন যে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী ব্যক্তি কখনও অন্যের অনিষ্ট করেন না, এমনকি যে স্থলে অন্যের সুখের সঙ্গে নিজ সুখের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে, সেক্ষেত্রে নিজের সুখের পরিবর্তে অন্যের সুখের জন্য কর্ম সাধন করাই তার ধর্ম। পুনঃপুনঃ তিনি এ কথাও বলেছেন যে স্বদেশ রক্ষাই হল বড় ধর্ম।

অনুশীলনের ফল হল ধর্ম। আর এই ধর্মের ফল হল সুখ—একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। অনুশীলনের জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজন—সময়, শক্তি এবং উপাদান।[৩৬] যেহেতু মানুষের জীবনে সময় ও শক্তি সঙ্কীর্ণ, সেহেতু যে বৃত্তিগুলি স্বতস্ফূর্ত পরিণতি প্রাপ্ত হয় সেগুলির প্রতি অতিরিক্ত সময় অপচয় না করে, যে বৃত্তিগুলির, যথা- ভক্তি, দয়া, প্রীতি ইত্যাদির, পরিণতি অনুশীলন সাপেক্ষ, তাদের সমুচিত স্ফূর্তি ও পরিণতির জন্য অধিক অনুশীলন করলেই সকল বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য আসবে। আর যতক্ষণ না সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণতি হবে

---

[৩৫] Thrilly, Frank. A History Philosophy. 3rd. Central Book Depot, 1950. p. 17

[৩৬] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৯৯

ততক্ষণ সুখ-প্রাপ্তি ঘটবে না। অনুশীলন তত্ত্বের মূল বিষয় এই 'সামঞ্জস্য'-এর ধারণা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'সামঞ্জস্য'-এর ধারণাটিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের কথা বললেও, এই পারস্পারিক সামঞ্জস্য কিন্তু নির্ভর করে ভক্তির ওপরে। বঙ্কিমের মতে, "যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি"।[৩৭] অন্যান্য বৃত্তিগুলির অনুশীলন জন্য যে স্ফূর্তি ও পরিণতি, তা যদি ভক্তির দ্বারা শাসিত না হয়, তাহলে, সামঞ্জস্য থাকবে না, ফলত মানবদ্ধর্মের মূল লক্ষ্য যে সুখ তা আহরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অর্থাৎ বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে তিনি একপ্রকার ক্রমবিন্যাস করেছেন। তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে আছে ভক্তি। এই ভক্তি কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিকে বোঝায় না। বিশ্বের সর্বভূতের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। যদিও ধর্মের অন্তিম পর্যায় হল ঈশ্বরে ভক্তি। যে অবস্থায় ব্যক্তির বা মানুষের সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের প্রতি নিয়োজিত হবে, সেই অবস্থাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি ঘটবে। এই কারণেই বঙ্কিম ধর্মের ব্যাখ্যায় পরকালকে উপেক্ষা করলেও কখনও ঈশ্বরকে বিযুক্ত করে ধর্ম ব্যাখ্যা দেননি। প্রকৃত অনুশীলনের মাধ্যমে সকল ব্যাক্তি নিজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে সক্ষম এবং প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি হয়ে উঠতেও সক্ষম।

মুক্তি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার থেকে বঙ্কিমের চিন্তা কিছুটা ভিন্ন। এই কারণে তিনি আত্মপ্রেম বা আত্মপ্রীতির কথা বলেছেন। অন্যকে উপেক্ষা বা অবহেলা না করা, আত্ম-সংযম এবং সমাজস্থ সমস্ত জীবের প্রতি প্রীতিভাব হল প্রকৃত আত্মপ্রেম। এই আত্মপ্রেম

---

[৩৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬২০

হল বিশুদ্ধ প্রেম যেহেতু তা অতীন্দ্রিয় এবং আত্মার বিবেককে স্পর্শ করতে সক্ষম। তাঁর মতে যখন দেশের সার্বভৌমত্ব বিপদের মুখে তখন প্রচলিত অর্থে মুক্তি বলতে যা বোঝা হয় তা বর্তমান সমাজের ক্ষেত্রে ভয়ংকর। ভগবদ্গীতা-তে যে মুক্তিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম বলেছেন, কর্মহীন মুক্তি নিকৃষ্ট মানের মুক্তি। *ভগবদ্গীতা*-তে উল্লেখ আছে প্রকৃত মুক্তি তখনই প্রাপ্ত হবে যখন কর্মের সাথে ভক্তির সমুচ্চয় ঘটবে। ভক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "...যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিক বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে"।[৩৮] উল্লেখ্য যে ভক্তি একটি বৃত্তি মাত্র। ভক্তি মুক্তির উপায়। যদিও ভক্তি মুক্তির উপায় তবুও ভক্ত কখনও মুক্তির কামনা করে না এবং সেই কারণেই ভক্তি নিজেও ভক্তের কাছে একটা উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি লিখেছেন, "ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, ভক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্য বা অন্য ইষ্টসাধনের জন্য নহে"।[৩৯] তিনি আরও বলেন যে, "ভক্তি, সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভক্তি মুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য"।[৪০]

---

[৩৮] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬২০

[৩৯] ঐ, পৃষ্ঠা-৬৪২

[৪০] ঐ, পৃষ্ঠা-৬৪৩

ভক্তি ও প্রীতির ন্যায় দয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি যার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজনীয়। ভক্তি ও প্রীতি বৃত্তির যথার্থ অনুশীলন করলেই তবে দয়া বৃত্তির অনুশীলন সম্ভব। বঙ্কিম কিন্তু 'দয়া' শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেননি। ভক্তির অনুশীলনই যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনি প্রীতি বৃত্তির অনুশীলনই দয়া বৃত্তির অনুশীলন। বঙ্কিমের মতে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তি, প্রীতি ও দয়া একই সূত্রে সন্নিবদ্ধ, একে অপরের থেকে এদেরকে পৃথক করা যায় না। বঙ্কিমের মতে সকল বৃত্তিগুলির মধ্যে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জ্ঞান ছাড়া ঈশ্বরের উপাসনা ও ভক্তি কোনওটাই সম্ভব নয়। মূর্খের জন্য ঈশ্বর উপাসনা নেই। যে ব্যক্তি অধর্ম করে সে মূর্খ, অশিক্ষিত। তবে তাঁর মতে কেবল মাত্র লিখতে ও পড়তে জানলেই কেউ জ্ঞানী হয়ে যায় না। তিনি আরও বলেন যে কার্য্যকারিণী বৃত্তির অর্থাৎ কর্ম বৃত্তির অনুশীলনও জ্ঞান সাপেক্ষ। কর্ম হল জ্ঞান লাভের পন্থা এবং কর্মের মাধ্যমেই জ্ঞান লাভ করা যায়। তবে ধর্ম-অধর্মের জ্ঞান না থাকলে কিন্তু কর্ম করা যায় না। সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর সাপেক্ষ বৃত্তি। মনের শুদ্ধতার জন্য কর্ম-যোগ একান্ত প্রয়োজন। কারণ মনের শুদ্ধি না থাকলে কেউ জ্ঞানমার্গে পৌঁছতে পারে না। কর্মবিযুক্ত জ্ঞানমার্গে বঙ্কিমের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। তিনি লিখেছেন, "শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট; একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্মবিরুদ্ধ"।[৪১]

---

[৪১] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য

বঙ্কিমের মতে হিন্দুধর্মের মর্মে মর্মে যা আছে তা হল সৎ, চিৎ ও আনন্দের উপলব্ধির কথা। তবে তিনি এই বিষয়েও ওয়াকিবহাল ছিলেন যে ধর্মবেত্ত্বাগণ সৎ ও চিৎ বিষয়ে যতটা উপদেশ দিয়েছেন, আনন্দের সম্পর্কে সেইরূপ উপদেশ তারা দেননি। তাঁর ধর্মব্যাখ্যায় অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনও অত্যন্ত আবশ্যক। তাঁর মতে, "...বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির, ভক্ত্যাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্মের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়"।[৪২] পৌরাণিক শাস্ত্রের প্রতি বঙ্কিমের বিশ্বাসের কারণই হল এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, যেহেতু তাঁর মতে এই বৃত্তির অননুশীলন ধর্মের অসম্পূর্ণতাকে নির্দেশ করে।[৪৩] *ঋগ্বেদ* সংহিতায় যে ধর্ম আলোচনা আছে, সেখানে আনন্দের যথেষ্ট আলোচনা ছিল। কিন্তু *ঋগ্বেদ*-এ সৎ ও চিৎ-এর আলোচনা অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। সেই জন্য *উপনিষদ্*-এ চিন্ময় পরব্রহ্মের উল্লেখ আছে। কিন্তু *উপনিষদ্*-এ জ্ঞান ও ধ্যানের আলোচনা থাকলেও আনন্দাংশের আলোচনার অভাব আছে। উপনিষদের উদ্দেশ্য ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হলেও, সেখানে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন ও স্ফূর্তির জন্য, সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মে কোনও ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মে সৎ-এর উপাসনা নেই।[৪৪] কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্মে সৎ-এর উপাসনা, চিৎ-এর উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনাও প্রচুর পরিমাণে আছে। বঙ্কিমের মতে, "এক্ষনে যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বর যেমত

পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬১২

[৪২] ঐ, পৃষ্ঠা-৬৬৯

[৪৩] ঐ, পৃষ্ঠা-৬৬৬

[৪৪] ঐ, পৃষ্ঠা-৬৬৮

সৎস্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ, তেমন আনন্দস্বরূপ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম্ম কখনও স্থায়ী হইবে না"।[৪৫] চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কাজ হল আনন্দ অনুভব করা, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের উপভোগ। এক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য বিষয়ে চিন্তার কথা উল্লেখ করতে পারি, তাঁর মতে, "the logical relationships present in an intellectual proportion, and the aesthetic relationships indicated in the proportions of a work of art: both agree on one thing. They affirm that truth consists on in fact but in the harmony of facts."[৪৬] রবীন্দ্রনাথের সত্তা, জ্ঞান ও মানবের স্বরূপের ধারণা থেকে স্বাভাবিক এবং স্বতস্ফূর্তভাবেই শিল্প, সৌন্দর্য ও সৃষ্টিসম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, কোনও মানুষের পক্ষে কী সম্ভব তার সকল বৃত্তিগুলির সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ঘটানো? এই চিন্তা একধরনের অতিরঞ্জিত কল্পনা ছাড়া আর কী বা হতে পারে? কারণ এখনও পর্যন্ত এমন কোনও মানুষ বা ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়নি, যার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটেছে এবং সে বঙ্কিম সম্মত প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়েছে। সুতরাং এমন অনুশীলন তত্ত্বের মূল্যই বা কী? বঙ্কিমের মতে, একথা ঠিক যে আজ পর্যন্ত এমন কেউ সকল গুণের অধিকারী হয়নি। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে, সকল গুণের অর্থাৎ বৃত্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, "তবে আমি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত

---

[৪৫] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৬৮

[৪৬] Bhowmik, Jagadindra, ed, Rabindranath Tagore in Perspective: A Bunch of Essays. Calcutta, 1989. p.32

অবলম্বনে ইহাই হইবে যে, লোকে সর্ব্বগুণ অর্জ্জনের জন্য যত্নে বহুগুণসম্পন্ন হইতে পারিবে, সর্ব্বসুখ লাভের চেষ্টায় বহু সুখ লাভ করিতে পারিবে"।[৪৭]

সাধারণত মনে করা হয় যে, ধর্ম কেবলমাত্র ঈশ্বর ও পরকালের সাথে আমাদেরকে সংযুক্ত করে। কিন্তু বঙ্কিমের মতে, ধর্ম শুধুমাত্র ঈশ্বর ও পকালের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, প্রকৃতার্থে ধর্মের সাথে ঈশ্বর, মানুষ এবং জগতের সমস্ত জীবের সম্পর্ক বর্তমান। আর যদি ধর্ম সুখলাভের প্রকৃত উপায় হয় তাহলে, জগতের সমস্ত কিছুই ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত—এটাই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর মতে প্রত্যেকের কর্তব্য হল, মনকে শুদ্ধ করা এবং আত্মায় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা।

বঙ্কিমের দৃষ্টিতে বৈষ্ণব ধর্মই হল অন্যান্য সকল ধর্মের 'সারমর্ম'। বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যমেই আমরা প্রকৃত ধর্মের বিশ্লেষণ করতে পারি। সকল বিশুদ্ধ ধর্মের অন্তরালে বৈষ্ণব ধর্ম লুকিয়ে আছে। প্রহ্লাদ যে ধর্ম এবং ভক্তির কথা বলেছেন তাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বিষ্ণুই হলেন এই জগতের প্রভু । তিনি অর্থাৎ বিষ্ণুই হল একমাত্র বৈষ্ণব এবং হিন্দু, যিনি সর্বজ্ঞ, আনন্দময় এবং যিনি সকল জীবের অন্তরাত্মা। বাহ্মণ্যধর্মকে এই বৈষ্ণব ধর্মে নিমজ্জিত করা সম্ভব। সুতরাং, বঙ্কিমের মতে যদি ব্যাপকার্থে ধর্ম বলতে অনুশীলন বুঝি, তাহলে পূর্ণ ধর্ম বলতে সেই ধর্মকেই বুঝতে হবে, যা এই অনুশীলনের ভিত্তি প্রদান করবে। যদি কোনও ধর্মে পূর্ণ ব্যক্তির আদর্শ অস্বীকৃত হয় বা 'মানব ধর্ম'-এর ন্যায় সর্বোচ্চ আদর্শ অস্বীকৃত হয়, সেই ধর্মকে পূর্ণ ধর্ম বলা যায় না। যেহেতু নৈতিকতার পূর্ণতা নির্ভর করে

[৪৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৯১

সমাজস্থ অন্যান্য জীবের প্রতি আমাদের ব্যবহার বা আচরণের ওপর। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য না থাকলে সেই ধর্ম সংকীর্ণ ও ধর্মান্ধতায় পর্যবশিত হয়। বঙ্কিমের মতে একমাত্র হিন্দুধর্মে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই কারণেই হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাঁর এই মতের সমর্থনে হাস্টন স্মিথের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। হাস্টনের মতে –

> if we are to take Hinduism as a whole…its vast literature, its opulent art, its elaborate rituals, its sprawling folk ways…if we were to take this enormous out look in its entirely and epitomize it in a single, central affirmation, we could find it saying to man: You can have what you want.[৪৮]

[৪৮] Smith, Huston. *The Religion of Man*. New York: Harper and Row Publisher, 1965. p.16

সপ্তম অধ্যায়

নৈতিকতা

'নৈতিকতা' শব্দটি সেই কর্ম বা কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলি নৈতিক বা অনৈতিক হয়। নীতিবিদ্যা বা নৈতিকতার সাথে একপ্রকারের বাধ্যতার ধারণা যুক্ত আছে। এক সময় নৈতিক তত্ত্ব সমূহ ধর্ম যাজক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ১৯ শতকের নীতিবিদরা যুগোপযোগী করে নৈতিকতার পুনর্গঠন করেছিলেন। পরবর্তীকালে কোঁৎ, মিল, স্পেন্সারের মত চিন্তাবিদরা এক স্বাভাবিক নৈতিক তত্ত্ব গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যা কিনা সমস্ত ধর্মীয় ও অতীন্দ্রিয় বিষয় থেকে মুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রও উনিশ শতকের চিন্তাবিদদের অনুসরণ করেছিলেন এবং ধর্মীয় নীতির ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে হিন্দু ধর্ম, অন্যান্য সামগ্রিক নৈতিক নিয়মাবলীর ন্যায়, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির আচরণ ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। হিন্দু ধর্মনীতি একাধারে যেমন নীতি তত্ত্ব তেমনি তা সমাজ তত্ত্বও। হিন্দু নীতি তত্ত্ব কখনও হিন্দু ধর্ম থেকে পৃথকভাবে গড়ে ওঠেনি। কারণ হিন্দুরা কখনও ধর্মচিন্তা ও অন্যান্য বিষয়ক চিন্তার মধ্যে কোনও পার্থক্য করেনি। ফলত হিন্দুদের ধর্মীয় ও জীবনের অন্যান্য দিকগুলি একই নিয়মনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি, যা কিনা জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি চেয়েছিলেন এই সমন্বয় এমন হবে যেটা বাস্তব এবং যাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। মোহিতলাল মজুমদারের মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ধর্ম কোনও জীবনাতিরিক্ত বিষয় নয়, বরং সত্য ধর্ম সর্বদা ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে

নিজের পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করে। বঙ্কিমের মতে ব্যক্তির কিছু বৃত্তি আছে। মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য উক্ত বৃত্তিগুলির অনুশীলন, পরিচর্যা ও উন্নতি প্রয়োজন। এটাই মানুষের বা ব্যক্তির ধর্ম। বৃত্তিগুলির চরম উৎকর্ষের ফল হল সুখ। যখন এই সমস্ত বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে নিবেদিত হয়, সেই অবস্থাকে বলে ভক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্মের ভিত্তি হল ঈশ্বর। এই কারণে *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকের আলোচনা ব্যতীত ধর্মের আলোচনা করতে আগ্রহী হলেও, ধর্ম থেকে ঈশ্বরকে বিচ্যুত করে ধর্ম আলোচনা করতে চান না। যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করেন, সেহেতু ঈশ্বর আমার মধ্যেও আছেন। সুতরাং নিজেকে রক্ষা করা যেমন নৈতিক তেমনি অন্যকে রক্ষা করাও নৈতিক কর্ম। কারণ, আত্ম-প্রেম ও জগত-প্রেম একই বিষয়। বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ আছে যে, সমগ্র জগৎ হল বিষ্ণুর প্রসার, বিষ্ণুই সব। সব কিছুর মধ্যে সাম্য লক্ষ করা উচিত। নিজের সাথে অন্যান্য প্রাণীর একাত্মবোধই ঈশ্বর-প্রেম। যখন আমাদের সমস্ত বৃত্তিগুলি সামগ্রিক উন্নতি ঘটে এবং ঈশ্বরকে অনুসরণ করে তখন আমরা ভক্তি অনুভব করি। এই ভক্তিই পরবর্তিতে সার্বিক-প্রেমে পরিণত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আত্মপ্রেম, স্বজনপ্রেম, দেশপ্রেমের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। আত্মরক্ষার থেকে স্বজনরক্ষা বড় কর্তব্য। তেমনি স্বজনরক্ষার থেকে দেশরক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। অর্থাৎ, যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এবং সর্বভূতের প্রতি ভালবাসা একই হয়, তাহলে বলা যায় যে, দেশপ্রেম হল মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। *গীতা*-তেও বলা হয়েছে, যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন তাঁর কাছে নিজের কর্তব্য পালনের থেকে অন্যের জন্য কর্তব্য পালন বেশি ভাল—এর মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃত সুখ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, “ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়,

তবে মনুষ্য জীবনের সর্বাংশই ধর্ম্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম্ম”।[১] *গীতা*-তে কিছু নৈতিক নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে একাধারে দৈনন্দিন জীবনের দুর্দশা এবং অন্য দিকে কঠোর নৈতিকতা ও মুক্তির অনুসন্ধানের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে—যার ভিত্তি হল সামাজিক নৈতিকতা।

সামাজিক নৈতিকতা তখনই তার আদর্শ স্থানে পৌঁছাতে পারবে যখন ব্যক্তি শুধুমাত্র অন্যকে নিজের মত ভালবাসবে না, তার সাথে সাথে ব্যক্তি নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও আত্মপ্রেমেও বিমগ্ন থাকবে না। কতিপয় ব্যক্তিই নিজের সাথে সর্বজনীন ভালবাসার এরূপ মেলবন্ধনকে উপলব্ধি করতে পারে। নৈতিকতা ও নৈতিক জীবনকে ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্র আত্মার মুক্তি এবং অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে নিজেদের জীবনের একাত্মতা বোধের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। যিনি ভক্ত তাঁর ক্ষেত্রেই নৈতিকতা সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন। ভক্তি হল নিজের আত্মাকে জয় করার জন্য চরিত্রের দৃঢ়তা। যিনি সংযত মনের অধিকারী, যিনি নিরপেক্ষ, যিনি অন্যের প্রতি সৎ কর্ম করেন, যিনি চরিত্রবান তিনিই ভক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে অজ্ঞান হল ঈশ্বরকে জানার পথের অন্তরায়। তাঁর মতে অজ্ঞান বশত আমরা ভক্তির পথ ত্যাগ করে, বর্বরের ন্যায় জীবন যাপন করি। সেহেতু ভক্তিবৃত্তি ও প্রেমবৃত্তির অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে গীতাতে তাই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে, জ্ঞান হল সেই বিষয় যার দ্বারা ব্যক্তি নিজের আত্মার মধ্যে এবং ঈশ্বরের মধ্যে সর্বভূতকে প্রত্যক্ষ করে। তাই

---

[১] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*. ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৯৬

আমাদের সকল জ্ঞানের উন্নতিসাধন ও পরিণত অবস্থা প্রয়োজন। যখন ভক্তিবৃত্তির দ্বারা শাসিত হয়ে জ্ঞানবৃত্তির উন্নতি হবে তখনই তা ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হবে, অন্যথায় নয়। এখানে আমরা লক্ষ করতে পারি যে বঙ্কিম প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলেছেন, যা কিনা ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম পন্থা—যাকে জ্ঞান-ভক্তি সমুচ্চয়বাদ বলা হয়। তাঁর মতে যদি সমস্ত বৃত্তিগুলির অনুশীলন ধর্ম হয় তাহলে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনও ধর্ম। কারণ ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য করার ক্ষেত্রে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন আবশ্যক। যদি আমরা ত্যাগ, ব্রতপালন, দান-ধ্যান, অন্যের প্রতি উচিত কর্মকে ধর্ম বলি তাহলে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সেক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, যারা 'ধর্ম' বলতে শুধু ঈশ্বরের প্রতি ধ্যানকে বোঝে তাদের ক্ষেত্রেও শারীরিক অসুস্থতা মুক্তির একটি অন্যতম অন্তরায়। যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে অসুস্থ, সে কখনও ঈশ্বরের প্রতি নিজের মন নিমগ্ন করতে পারে না। যোগীর যোগ বা সমাধির ক্ষেত্রে এবং ভক্তের উপাসনার ক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতা প্রধান অন্তরায়। বঙ্কিমের মতে ধর্মের মূল বাধা হল শারীরিক অসুস্থতা। তাই ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে শারীরিক বৃত্তি গুলির অনুশীলন একান্তভাবে প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যিনি মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকে সমস্ত গুণের অধিকারী।

আমরা শ্রীকৃষ্ণকে হয় জয়দেবের কৃষ্ণ অথবা যাত্রার কৃষ্ণ হিসেবে চিনি। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, যে কৃষ্ণের শারীরিক বৃত্তি গুলি পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, যাঁর মানসিক বৃত্তিগুলির চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে, যিনি সকল মানুষের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা বিস্তার করেন, সেই আদর্শ কৃষ্ণ সম্পর্কে আমরা অবগত নই। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন স্থায়ী সুখের সাথে

আচরণের নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই তিনি ধর্মীয় তত্ত্বালোচনার থেকে আচরণের আলোচনা করতে বেশি আগ্রহী। তাঁর মতে সমস্ত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন ফলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা আসে। ব্যক্তি সেই অবস্থায় সমস্ত গুণের এবং সুখের অধিকারী হতে পারে—এই অবস্থাকেই বঙ্কিম ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের অবস্থা বলেছেন। এই বিষয়ে আমরা মোহিতলাল মজুমদারের কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মতে,

> This religion should rightly called 'Religion of Humanity' and hence exercise of the faculties is the essence of the religion. Bankim Chandra has adopted as his guiding principle the great western thinker's statement that substance of religion is culture.[২]

কিন্তু আমরা এও বলতে পারি না যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণ, বরং বঙ্কিমের মতে অনুশীলন হিন্দুধর্মের সারাংশ। *গীতা*-র উল্লিখিত 'অমৃত-সমান' ধর্ম কথার ভিত্তি হল অনুশীলন।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে নৈতিকতার ভিত্তি হল জীবতত্ত্ব। তাঁর মতে নব নৈতিকতা অবশ্যই জীবতত্ত্বের ওপরে নির্ভর করে গড়ে ওঠা উচিত। জৈবিক বিবর্তনের তত্ত্ব অনেক নৈতিক ধারণাকে নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। অন্যান্য বিষয়ের মত আচরণের ভাল বা অনৈতিক হওয়া নির্ভর করে জীবনে তার প্রভাবের ওপর। সর্বোচ্চ আচরণ হল তাই যা জীবনের ব্যাপ্তি, উদারতা এবং সম্পূর্ণতাকে ত্বরান্বিত করে।[৩] স্পেন্সারের মতে কোনও আচরণ নৈতিক হবে যদি তা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিষম উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সংহতি ও সংসক্তি প্রতিষ্ঠা

---

[২] Chatterjee, Bhabatosh, Ed. *Bankimchandra Chatterjee: Essays in Perspective.* Delhi, 1974. p.192

[৩] Durant, Will. *The Story of Philosophy*. United State: Simon and Schuster, 1926. p.385

করতে সক্ষম হয়। তিনি মনে করতেন যে, নৈতিকতা হল শিল্পের মতন, যা কিনা নানাত্ব বা বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের খোঁজের মধ্যে দিয়ে সাধন করা যায়। সর্বোচ্চ মানুষ হল সেই ব্যক্তি যে নিজের মধ্যে ব্যাপকতর বিভিন্নতাকে, জটিলতাকে এবং জীবনের সম্পূর্ণতাকে একসূত্রে গাঁথতে সক্ষম।

কান্টের সময় থেকেই বহু ভাববাদী দার্শনিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে বুদ্ধির গুরুত্বের কথা বলেছেন এবং তাঁদের মতে বৌদ্ধিক সংহতি হল নৈতিকতার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। কান্টের মতে ধর্মই নৈতিকতা।[৪] তাঁর মতে, "God became simple a name for the Categorical Imperative itself or a name for a purely subjective projection of a voice speaking through a moral law"।[৫] অর্থাৎ ঈশ্বরই হলেন নিরপেক্ষ অনুজ্ঞার আরেকটি নাম মাত্র। কিন্তু স্পেন্সারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে নিরাপত্তার বিষয়টি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। স্পেন্সারের মতে নৈতিক কর্মের মর্মার্থ বোঝার জন্য সমস্ত জীবের আচরণ এবং আচরণের বিবর্তন বোঝা প্রয়োজন। তাঁর মতে সেই আচরণই ভাল যা ব্যক্তির নিজের জীবন, বংশ এবং সহ-নাগরিকদের জীবনকে সংরক্ষণ করতে সহায়ক।[৬] অর্থাৎ, আচরণের নৈতিকতা ব্যক্তির নিজের জীবনের ওপরে কেবলমাত্র সীমিত নয়, তার পাশাপাশি সমাজের এবং অন্যান্য ব্যক্তির জীবনের সাথেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও আমরা অনুরূপ ভাবনা দেখতে পাই। এমনকি বঙ্কিমের মতে কর্মের বা আচরণের নৈতিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে

---

[৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৭৪

[৫] Copleston, F. *A History of Philosophy*. Vol. 6. United Kingdom: Continuum, 1963, p.179

[৬] Hollingworth, Harry L. *Psychology and Ethics: A Study of the Sense of Obligation*. New York: Ronald Press. 1949, p.20

অনেক সময় ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা ত্যাগ করতে হয়। তাই জন্য তাঁর মতে আত্মরক্ষার থেকে সমাজরক্ষা বড় ধর্ম। তবে বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুবাদকে অস্বীকার করে গীতোক্ত ভক্তির কথা বলেছেন, যা কিনা ব্যক্তির সমস্ত বৃত্তিগুলির অনুশীলনের ফল। তাঁর মতে, আত্মরক্ষা, স্বদেশরক্ষা, অন্যের অত্যাচার থেকে রক্ষা ইত্যাদি কর্ম ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত এবং সেহেতু এগুলি অবশ্য পালনীয়। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত স্বদেশরক্ষা করা, স্বজাতিও কেউ অত্যাচারিত হলে তাকেও রক্ষা করা এবং নিজের দেশের তথা সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য কর্ম সাধন করা।

খৃষ্টধর্ম অনুযায়ী ব্যক্তির উচিত অন্যের প্রতি সেই আচরণই করা যেরূপ আচরণ সে অন্যের থেকে নিজের প্রতি আশা করে—এখানে কিন্তু অন্য ব্যক্তির মঙ্গলের প্রধানতা কথা বলা হচ্ছে না, বরং অন্যের মঙ্গল ও ব্যক্তির নিজের মঙ্গলের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবেই খৃষ্টধর্মকে বুঝেছিলেন। তাঁর মতে, যদিও কখনও কখনও পরিস্থিতির কারণে আত্মসুখ বা ব্যক্তির নিজের মঙ্গলের তুলনায় অন্যের মঙ্গল বা অপরের সুখের প্রধানত স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু এখানে একটি স্থলে নৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়—যেক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের সুখ বা মঙ্গল এবং অন্য ব্যক্তির সুখ বা মঙ্গল পরস্পর বিরোধী হয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল কার সুখের বাস্তবায়ন করা উচিত হবে? বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কয়েকটি সমাধান সূত্র দিয়েছেন—যার ভিত্তি উপযোগবাদ এবং ভারতীয় ধর্মনীতি। প্রথমত, অন্যের প্রতি যেকোনও রকমের হিংসামূলক বা অন্যায় আচরণকেই (কায়িক, বাচনিক ও মানসিক) হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মে অ-ধর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি আধুনিক দার্শনিকগন ও নীতিবিদগণ অনুরূপ

মতামত পোষণ করেন। সুতরাং, উক্ত দ্বন্দ্ব উপশমের প্রথম নিয়ম এই যে, অন্যের মঙ্গলের হেতু আচরণ বা কর্ম করা সর্বদা কাম্য। এবিষয়ে বঙ্কিমের বক্তব্য হল

> ...সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের অনিষ্টমাত্র অধর্ম্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ...অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিঘ্নকর এবং যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। ...এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্দ্বারা আপনার হিতসাধন করিবে না, ইহা অনুশীলনধর্ম্মের এবং হিন্দুধর্ম্মের আজ্ঞা।[৭]

দ্বিতীয়ত উপযোগবাদ বা হিতবাদ, যাকে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের অংশ বলে বিবেচনা করেছেন। যদিও এই দ্বিতীয় নিয়ম প্রথম নিয়মের প্রসারণমাত্র। তাঁর মতে, ধর্ম ভক্তিতে, সর্বভূতে সমদৃষ্টিতে। হিতবাদ সেই ধর্মের সহস্র স্রোতের মধ্যে একটি স্রোত মাত্র। তিনি বলেছেন যে, তত্ত্বটা সত্যমূলক কিন্তু ধর্মের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। বঙ্কিমের মতে হিতবাদীদের "Greatest good for the greatest number" নীতিটি অনুশীলনধর্মে গণিততত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।[৮]

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরের হিতসাধনের তুলনায় নিজের হিতসাধন করা কর্তব্য বলে বঙ্কিম মনে করেন, তাই তৃতীয় নিয়ম সম্পর্কে বঙ্কিমের মত হল, অনেক সময় ব্যক্তির আত্মসুখ যতটা আয়ত্ত করা যায়, পরের সুখ বা মঙ্গল ততটা আয়ত্ত করা যায় না। যেমন আমরা যত

---

৭ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৫৩

৮ ঐ, পৃষ্ঠা-৬৫৩

সহজে নিজেদের মানসিক উন্নতি ঘটাতে সক্ষম, পরের ক্ষেত্রে তত সহজে পারা যায় না। সেই ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে নিজের মানসিক উন্নতি সাধন কর্তব্য, কেন না, তা সিদ্ধ হওয়ার সম্ভবনা বেশি। এই ক্ষেত্রে পরপক্ষ অপেক্ষা নিজপক্ষ গ্রহণ শ্রেয়। এমন কী যেখানে শত্রু আক্রমণ করেছে সেখানে আগে নিজের রক্ষা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। কারণ নিজের রক্ষায় যে অপারগ সে কীভাবে পরের রক্ষা করবে, অর্থাৎ হিতসাধন করবে?[৯]

বঙ্কিমচন্দ্র ও উপযোগবাদ

নৈতিকতা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনা বহুলাংশে পাশ্চাত্য বহু দার্শনিক এবং চিন্তাবিদের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মিল, বেন্থাম, ব্রাডলে প্রমুখ। সেই কারণে বঙ্কিমের নৈতিক ভাবধারা অবধাবনের পূর্বে আমাদের কর্তব্য পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় নৈতিকতার আলোচনার মূল ধারা গুলি সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হওয়া। পাশ্চাত্যে মূলত দুটি মূল ধারায় নৈতিকতার আলোচনা হয়ে এসেছে – কর্তব্য নির্ভর নৈতিক তত্ত্ব এবং সদ্গুণ নির্ভর নৈতিক তত্ত্ব। কর্তব্য নির্ভর নৈতিকতার মূল বিষয় হল কর্মের নৈতিক বিচারের মাধ্যমে কর্তার নৈতিক বিচার করা। সেক্ষেত্রে কোনও কর্তাকে তখনই নৈতিক বলা যাবে যদি সেই কর্তা কর্তৃক কৃত কর্মটি নৈতিক হয়। অর্থাৎ কর্ম নৈতিক হলে সেই কর্মের কর্তাও নৈতিক হবে এবং কর্ম যদি অনৈতিক হয় তাহলে তার কর্তা অনৈতিক হবে। তবে, কর্মের নৈতিকতা প্রসঙ্গে কিন্তু সমস্ত নীতিবিদ, যারা কর্তব্য নির্ভর নীতিবিদ্যায় বিশ্বাসী, তাঁরা একই মত পোষণ করেন না। কর্তব্য নির্ভর নৈতিক তত্ত্বের আবার দুটি মূল ঘরানা আছে। একটি হল কর্তব্যমুখী নৈতিক তত্ত্ব এবং অন্যটি হল ফলমুখী নৈতিক তত্ত্ব। মিল,

---

[৯] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৫৫

বেন্থাম সমর্থিত উপযোগবাদ এক প্রকারের ফলমুখী নৈতিক তত্ত্ব। ফলমুখী নৈতিকতার বক্তব্য হল কোনও কর্মের নৈতিকতা নির্ভর করে সেই কর্মের দ্বারা উৎপন্ন ফলের ওপর। সেক্ষেত্রে যদি কর্মের ফল ভাল হয় তাহলে কর্মটিও নৈতিক হবে, অন্যথায় সেটি অনৈতিক কর্ম বলে বিবেচ্য হবে। যেমন উপযোগবাদ অনুযায়ী কর্মফলের উপযোগিতার ওপর নির্ভর করে কোনও কর্ম নৈতিক হবে না অনৈতিক হবে। কোনও কর্ম নৈতিক হবে যদি তা সর্বাধিক উপযোগ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার দ্বিতীয় ঘরানা হল সদ্গুণ নির্ভর নৈতিক তত্ত্ব। অ্যারিস্টটলের দর্শনের মধ্যে সদ্গুণ নির্ভর নৈতিক তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়, পরবর্তীকালে অ্যালেসডায়ার ম্যাকইনটায়ার, ফিলিপ্পা ফুট, এলিজাবেথ অ্যান্সকমব, মার্থা নুসবাম প্রমুখ দার্শনিক উক্ত তত্ত্বের বিস্তার ঘটান। কর্তব্য নির্ভর নীতিবিদ্যার বিরুদ্ধে এদের মূল আপত্তি হল যে, কর্তব্যকে কেন্দ্র করেই সমস্ত নৈতিকতার আলোচনা আবর্তিত হয়, সেখানে কর্ম-কর্তার কোনও ভূমিকা প্রায় আলোচিত হয় না। তাই, এঁদের মতে, কর্ম নয়, মূলত কর্তার নৈতিকতায় নীতিবিদ্যার বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। কর্মের নৈতিকতার থেকে কোনও ব্যক্তি সদ্গুণের অধিকারী কিনা সেই আলোচনায় প্রাধান্য পাওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি ভিন্ন তার কৃত কর্মের নৈতিকতা আলোচনা সম্ভব নয়। কর্তা যদি নৈতিক হয় তাহলে তার দ্বারা কৃত কর্মটিও নৈতিক হবে, অন্যথায় তা অনৈতিক বলে বিবেচিত হবে। এঁদের মতে কোনও ব্যক্তি হয় সদ গুণের অধিকারী হবে অথবা হবে না। যে ব্যক্তি সদ্গুণের অধিকারী সেই ব্যক্তিই নৈতিক এবং সেই ব্যক্তি যা কর্ম করে তা নৈতিক কর্ম।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় নৈতিকতার যে ধারণা পরিলক্ষিত হয় সেখানে আমরা দেখতে পায় যে, বঙ্কিমের নৈতিকতার ধারনাকে উপরিউক্ত বিভিন্ন পাশ্চাত্য নৈতিকতার তত্ত্বের মধ্যে কোনও একটি তত্ত্বে স্থাপন করা সম্ভব নয়। যদিও বঙ্কিমের ওপর মিলের উপযোগবাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল তবুও তার রচনার গভীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সদ্গুণ নির্ভর নৈতিকতার প্রতি তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর মিল ও বেন্থামের উপযোগবাদের প্রভাব কতখানি ছিল তা সহজেই বোঝা যায় তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের মাধ্যমে। সেহেতু আমরা প্রথমে মিল ও বেন্থামের উপযোগবাদের বিস্তারিত আলোচনা করব এবং তারপর অনুশীলনতত্ত্বে উপযোগবাদ, যাকে বঙ্কিম ‘হিতবাদ’ বলতেন, তার প্রভাব আলোচনা করব। পাশ্চাত্যের সুখবাদী নৈতিকতার একটি অন্যতম ধারা হল এই উপযোগবাদ। উপযোগবাদের সাথে মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ও বেন্থামের (১৭৪৮-১৮৩২) নাম সর্বাধিকভাবে জড়িত থাকলেও, এঁরা কিন্তু উপযোগবাদের একমাত্র প্রবর্তক নন। মিল, বেন্থামের বহু পূর্বে এপিকিউরাস, অ্যারিষ্টিপাস প্রমুখ দার্শনিক উপযোগবাদের কথা বলে গেছেন। এমন কী অ্যারিস্টটলের নীতিবিদ্যার ইউডেমনিয়া (Eudaimonia) বিষয়ক আলোচনায়ও উপযোগবাদী চিন্তাভাবনা লক্ষ করা যায়। তবে একথা সত্য যে, মিল ও বেন্থামের হাত ধরেই উপযোগবাদ সম্পূর্ণতা পেয়েছে। বেন্থামের *Principles of Morals and Legislation* এবং মিলের *Utilitarianism* গ্রন্থে উপযোগবাদের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উপযোগবাদ একধরণের ফলমুখি নৈতিক তত্ত্ব। উপযোগবাদীদের মতে, কোনও কর্ম তখনই নৈতিক হবে যদি সেই কর্মের ফলের সর্বাধিক উপযোগিতা থাকে। অর্থাৎ উপযোগিতার নীতি মেনে যদি কর্ম করা হয়, তাহলেই

সেই কর্ম নৈতিক হবে অন্যথায় তা অনৈতিক হবে। সুতরাং, আমাদের বুঝতে হবে যে, 'উপযোগিতার নীতি' কী?

বেন্থামের মতে সমগ্র মানবজাতি নিয়ন্ত্রিত হয় দুটি সার্বভৌম নিয়ন্ত্রকের দ্বারা—সুখ এবং দুঃখ।[১০] সুখ এবং দুঃখই নির্ধারণ করে আমাদের কী করা উচিত এবং আমরা কী করব । সুখ-দুঃখই হল ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি। আমরা যা কিছু করি, যা কিছু বলি। এমন কী যা কিছু চিন্তা করি এবং পরাধীনতার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে যা কিছু প্রচেষ্টা করি, তা সব কিছুই এই সুখ ও দুঃখের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং, আমাদের সমস্ত কার্যের ভিত্তি হল উপযোগিতার নীতি (principle of utility[১১])। এই নীতিকে কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেন্থাম বলেছেন,

> "উপযোগিতার নীতি বলতে সেই নীতিকে বোঝায় যা প্রত্যেক কার্যের, সে যেকোনও ধরণের কার্য হোক না কেন, অনুমোদন অথবা অননুমোদনকে সূচিত করে, সেই কার্যের আনন্দ বৃদ্ধি অথবা আনন্দ হ্রাসের ক্ষমতার প্রবণতা অনুসারে।"[১২]

---

[১০] Bentham, J. *Principles of Morals and Legislation*. Dover Publication, 1789. Chapter-1

[১১] 'Utility' শব্দটি বেন্থাম তাঁর প্রথম দিকের রচনায় ব্যবহার করেননি। পরবর্তিকালে তিনি এই শব্দটি তাঁর লেখাতে ব্যবহার করেছেন। তার কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে, 'utility' শব্দটি যথার্থভাবে pleasure ও pain-এর ধারণাকে বহন করে না, যেভাবে 'happiness' এবং 'felicity' শব্দের দ্বারা সুখ ও দুঃখকে বোঝা সম্ভব।

Bentham, J. *Principles of Morals and Legislation*. Dover Publication, 1789. Chapter-1. footnote.

[১২] "By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency which it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words, to promote or to oppose that happiness."

Bentham, J. *Principles of Morals and Legislation*. Dover Publication, 1789. Chapter-1

'যে কোনও কার্য' এই বিষয়টির ওপরেই বেন্থাম বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর মতে যদি কোনও কার্য সর্বাধিক আনন্দ উৎপাদনে অক্ষম হয়, তাহলে সেই কার্য অনৈতিক হবে। নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর এই ধরণের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তির মনের প্রকৃতি সম্পর্কে কী ভাবনা তার আভাস পাওয়া যায় – তা হল কার্যের প্রতি ব্যক্তির প্রাথমিক প্রেরণা হল আনন্দ এবং দুঃখ। তবে নৈতিকতা সম্পর্কে বেন্থামের উক্ত মত বিচার করলে একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—কার্যের নৈতিকতা যদি সুখ দুঃখের নিরিখে নির্ধারিত হয় তাহলে প্রশ্ন হবে, এই সুখ বা দুঃখ কার? নৈতিকতার ক্ষেত্রে কী ব্যক্তির নিজস্ব সুখ দুঃখই বিচার্য, না কি অপরের সুখ দুঃখও বিচার্য বিষয়? আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বেন্থামের মতে ব্যক্তির আত্মগত সুখই নৈতিকতার মানদণ্ড। তা কিন্তু নয়। বেন্থাম নিজেও এরূপ সমস্যা বা প্রশ্ন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। প্রথমত বেন্থাম মনে করতেন যে, ব্যক্তি স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিতভাবে উপযোগিতার নীতি মেনেই কার্য করে-তা খুব সহজেই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায়। প্রকৃত পক্ষে তাঁর মতে, প্রচলিত সমস্ত নৈতিকতার তত্ত্বকে 'সহানুভূতি ও অনাসক্তি'র নীতির (principle of sympathy and antipathy) দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় এবং এই নীতি আসলে উপযোগিতার নীতিকেই নির্দেশ করে। তাছাড়াও, নৈতিকতার মাপকাঠি যদি সুখই হয় তাহলে তা কার সুখ, ব্যক্তির নিজস্ব না অপরের, তা বিচার্য বিষয় হতে পারে না। সুতরাং কোনও বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থ ব্যতিরেকেই, কার্যের নৈতিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুখের বা আনন্দের নিরপেক্ষ ক্ষমতায় যথেষ্ট। বেন্থাম আরও বলেন যে, ব্যক্তি স্বভাবতই নিজের সুখের পরিবর্তে সাধারণ সুখের দ্বারা কার্যে প্রবৃত্ত হয়। কারণ সে জানে যে সাধারণের সুখের মধ্যেই তার নিজের সুখ

বর্তমান। ফলত বেন্থামের উপযোগবাদকে সার্বিক সুখবাদও বলা যেতে পারে।[১৩] উপযোগবাদ পূর্ণতা লাভ করেছে মিলের রচনার মাধ্যমে। উপযোগিতার নীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিল তাঁর গ্রন্থে বলেছেন,

> ‘উপযোগিতা’ বা ‘অধিকতম আনন্দ নীতি’ অনুযায়ী কোনও কার্য সেই পরিমাণে নৈতিক হবে যে পরিমাণ আনন্দ সেই কার্য উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে, এবং অনৈতিক হবে যখন সে আনন্দের বিপরীত উৎপাদন করবে। আনন্দ বলতে সুখ এবং দুঃখের অভাবকে বোঝানো হয়েছে; নিরানন্দের দ্বারা দুঃখের উপস্থিতি এবং সুখের অভাবকে বোঝা হয়েছে।[১৪]

উক্ত উপযোগিতা নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মত হল,

> ...যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে এক জনের হিতসাধন ধর্ম্ম, আবার একজনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম্ম। যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম্ম; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম্ম। এখানে “Good of the greatest number”।[১৫]

---

[১৩] Henry Sedgwick বেন্থামের উপযোগবাদকে ‘সার্বিক বা সমষ্টিগত সুখবাদ’ বলেছেন।

Sidgwick, H. *Methods of Ethics*. United Kingdom: Macmillan & Co., 1874, p-407

[১৪] “Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure.”

Mill, J. S., *Utilitarianism*. London: Parker, Son and Bourn, West Strand, 1863. Chapter-2

[১৫] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৫৩

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে বঙ্কিমের মতেও নৈতিকতার মাপকাঠি হল এই উপযোগিতার নীতি। সেক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে ন্যায়-অন্যায় বা ধর্ম-অধর্মের বিচারের ক্ষেত্রে হিতবাদই গ্রহণীয়। উপযোগবাদ বা হিতবাদের[১৬] সমর্থনে বঙ্কিম আরও বলেছেন যে, 'হিতবাদ' এ দেশের পক্ষে নূতন কথা নহে-আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আমরা বুদ্ধদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম– 'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়'। তৎপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন–যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম, যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্-বিরুদ্ধ তাহা অসত্য, তাহা অধর্ম।[১৭]

সে যাই হোক, বাংলার সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয়কালে এ দেশে হিতবাদের কী পরিমাণ প্রভাব ছিল তা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে বলেছেন,

> "যেখানে সত্যলঙ্ঘনাপেক্ষা সত্যরক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? ...আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না–কেন না হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন।[১৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের মনে করতেন যে উপযোগবাদ সমগ্র ধর্মের একটি অংশ মাত্র, আর উপযোগিতার নীতিকে তিনি একটি গাণিতিক ফর্মুলা হিসাবেই গ্রহণ করতে বলেছেন। সুখের মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই উপযোগিতার নীতিই হল মানদণ্ড। বেন্থাম তাঁর

---

[১৬] বঙ্কিমচন্দ্র উপযোগবাদকে হিতবাদ বলতেন।

[১৭] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৬৭

[১৮] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. 'ভালবাসার অত্যাচার'. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-২১৭

উপযোগবাদে সুখের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সুখের মধ্যে পরিমাণগত তারতম্য স্বীকার করলেও, তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেননি। তাঁর মতে বিভিন্ন সুখ গুরুত্বের দিক থেকে পরিমাণগতভাবে কম কিম্বা বেশি হতে পারে এবং তা নির্ধারিত হয় সাতটি পরিস্থিতির বিচারে – তীব্রতা, স্থায়িত্ব, নিশ্চয়তা অথবা অনিশ্চয়তা, নৈকট্য অথবা দূরত্ব, উর্বরতা, বিশুদ্ধতা এবং বিস্তার।[১৯] তাঁর মতে, সমস্ত সুখই গুণগতভাবে একই শ্রেণিভুক্ত। একটি বিশেষ আনন্দ অন্য আনন্দের ন্যায় একই রকম ভাল। বিভিন্ন সুখের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচারের ক্ষেত্রে পরিমাণই হল একমাত্র মাপকাঠি, সেখানে বিভিন্ন আনন্দের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নেই । সুতরাং, বেন্থামের মত মেনে নিলে বলতে হয়, কাব্যপাঠের আনন্দ এবং পুস্-পিন খেলার আনন্দের একই মূল্য। বেন্থামের এরূপ চিন্তাভাবনার প্রতি একটু উপহাস করে বঙ্কিম বলেছেন, “কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই ‘আইভেনো’ অপেক্ষা এক বাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাহাঁদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন

---

[১৯] “considered with reference to a number of persons. To a number of persons, with reference to each of whom the value of a pleasure or a pain is considered, it will be greater or less, according to seven circumstances: to wit, the six preceding ones; viz.

1. *Its intensity.*
2. *Its duration.*
3. *Its certainty or uncertainty.*
4. *Its propinquity or remoteness.*
5. *Its fecundity.*
6. *Its purity.*

And one other to wit:

7. *Its extent; that is, the number of persons to whom it extends; or (in other words) who are affected by it.”*

Bentham, J. Principles of morals and legislation. Chapter-4

পাকা খেলোয়াড় বড় লোক?”[২০] অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র বেন্থামের উক্ত বক্তব্য স্বীকার করতেন না। তিনি মনে করতেন যে বিভিন্ন সুখের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য যেমন বর্তমান, তেমনই তাদের মধ্যে গুনগত পার্থক্যও আছে।

এখানেই মিলের উপযোগবাদের সঙ্গে বেন্থামের উপযোগবাদের মূল পার্থক্য। মিলের মতে বিভিন্ন সুখের মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণগত তারতম্য আছে তা নয়, বরং তাদের মধ্যে গুণগত তারতম্যও থাকে। মিল সুখের পরিমাণগত তারতম্যের তুলনায় গুণগত তারতম্যের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ মিলের মতে বিভিন্ন সুখের মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার না করলে, কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকার করলে, মানুষের সাথে পশুদের কোনও পার্থক্য করা যাবে না।[২১] কেননা, মানুষের মতন পশুরাও তাদের সহজাত প্রবৃত্তির(instinct) দ্বারা ইন্দ্রিয়জ সুখের প্রতি ধাবিত হয়। তাই তিনি বিভিন্ন সুখের মধ্যে গুনগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে সুখ বা আনন্দের মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে গুণের পরিবর্তে কেবলমাত্র পরিমাণকে মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করাটা হাস্যকর।[২২] তিনি সুখের উচ্চ-নিচ স্তরের কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল দুটি সুখের মধ্যে গুণগত তারতম্য নির্ধারণ কীভাবে সম্ভব? এই বিষয়ে মিলের বক্তব্য হল,

[২০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. ‘উত্তরচরিত’. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-১৮২

[২১] “since the accusation supposes human beings to be capable of no pleasures except those of which swine are capable”
Mill, J. S., Utilitarianism, ch-2

[২২] “It would be absurd that while, in estimating all other things, quality is considered as well as quantity, the estimation of pleasures should be supposed to depend on quantity alone.”
Mill, J. S., utilitarianism, ch-2

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সুখের গুণগত পার্থক্য বলতে আমি কী বুঝি, অথবা শুধুমাত্র সুখ হিসাবে, পরিমাণের আধিক্য ছাড়া, একটি সুখ কী কী কারণে অন্য সুখের থেকে মূল্যবান হয়, সেখানে একটাই উত্তর আছে। যদি এমন হয়, যেকোনও দুটি সুখের মধ্যে, যাঁদের ওই দুটি সুখ সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের সকলেই অথবা তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোনও রকম নৈতিক ঔচিত্যবোধ বা বাধ্যতা ব্যতিরেকে, কোনও একটি সুখের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন, তাহলে সেই সুখটি অধিক কাম্য বলে বিবেচিত হবে।[২৩]

বঙ্কিমচন্দ্রও মিলের ন্যায় উচ্চস্তরের-সুখ ও নিম্নস্তরের-সুখের কথা বলেছেন। ধর্মতত্ত্বে তিনি লিখেছেন, ভক্তি ও জাগতিক প্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর। তাঁর মতে সুখ দ্বিবিধ—স্থায়ী সুখ এবং ক্ষণিক সুখ। ক্ষণিক সুখ আবার দুপ্রকার–ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য এবং ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ। অনুশীলনের মাধ্যমেই স্থায়ী সুখ লাভ হয়। ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সমূহের সমুচিত অনুশীলনে উৎপন্ন সুখকে তিনি ক্ষণিক অথচ পরিণামে দুঃখশূন্য সুখ বলেছেন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সমূহের অসমুচিত অনুশীলনেই উৎপন্ন হয় ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ জনক সুখ।[২৪] বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব পর্যালোচনা

---

[২৩] "If I am asked, what I mean by difference of quality in pleasures, or what makes one pleasure more valuable than another, merely as a pleasure, except its being greater in amount, there is but one possible answer. Of two pleasures, if there be one to which all or almost all who have experience of both give a decided preference, irrespective of any feeling of moral obligation to prefer it, that is the more desirable pleasure. If one of the two is, by those who are competently acquainted with both, placed so far above the other that they prefer it, even though knowing it to be attended with a greater amount of discontent, and would not resign it for any quantity of the other pleasure which their nature is capable of, we are justified in ascribing to the preferred enjoyment a superiority in quality, so far outweighing quantity as to render it, in comparison, of small account."

Mill, J. S., utilitarianism, ch-2

[২৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬০২

করলেই হিতবাদ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা অনুধাবন করা যায়। সেই কারণে অনুশীলনতত্ত্বের বর্ণনা আবশ্যক।

বঙ্কিমের দার্শনিক রচনা গুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থটি। *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থটি গুরু-শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন আকারে লিখিত। সেখানে শিষ্য এক একটি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে আর গুরু তার উত্তর প্রদান করেন। এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় অনুশীলনতত্ত্ব। অনুশীলনতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম সুখ কী, ধর্ম কী, সুখের সাথে ধর্মের সম্পর্ক কী ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বিদগ্ধ চিন্তা প্রকাশ করেছেন। মানুষের বিভিন্ন বৃত্তি সমূহকে বঙ্কিম দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন– শারীরিক বৃত্তি এবং মানসিক বৃত্তি। মানসিক বৃত্তি গুলিকে আবার তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, যথা– কার্য্যকারিণী বৃত্তি, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। মানুষকে কর্মের প্রতি প্রবৃত্ত করে যে সকল বৃত্তি তাদের বলা হয় কার্যকারিণী বৃত্তি। যে বৃত্তি গুলি কেবল জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে অর্থাৎ যাঁদের উদ্দেশ্য জ্ঞান তাঁদের বলে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি। এছাড়াও যে বৃত্তিগুলি কোনও জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে না, কার্যে প্রবৃত্তও করে না; কেবলমাত্র আনন্দ অনুভূত করায় সেগুলিকে বলা হয় চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি।[২৫] বঙ্কিমের মতে বৃত্তির অনুশীলনই সুখ।

বৃত্তিসমূহের অনুশীলন প্রসঙ্গে বঙ্কিম অনুশীলন ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। অনুশীলন বৃত্তি-শক্তির অনুকূল এবং তা শক্তির বিকাশে সাহায্য করে। অনুশীলনের পরিণামে সুখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু, অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল, অভ্যাস শক্তির

[২৫] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-*৫৯৪*

বিকার ঘটায় এবং অভ্যাসের পরিণাম বা ফল হল সহিষ্ণুতা।[২৬] কেউ যদি বাধ্য হয়ে প্রত্যেক দিন নিম পাতার রস পান করে তাহলে অভ্যাস বশত ক্রমে ক্রমে সেই তিক্ত স্বাদ তার সহ্য হয়ে যাবে, যদিও সেই স্বাদ তার কাছে সুখের বা আনন্দের হয় না। এখানেই বোঝা যায় যে অনুশীলন ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য কীরূপ। তাই বঙ্কিমের মতে বৃত্তিগুলির পরিণতি সুখের হবে যদি সেগুলি যথাবিহিত অনুশীলিত হয়। বঙ্কিমের মতে সুখ বলতে বোঝায়, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির অনুশীলন এবং তারজন্য স্ফূর্তি ও পরিণতি। বৃত্তিগুলির একক পরিণতি ও স্ফূর্তিকে বঙ্কিম কিন্তু সুখ বলেননি। বিভিন্ন বৃত্তি সমূহের পারস্পারিক সামঞ্জস্য এবং তাদের পরিতৃপ্তিই হল প্রকৃত সুখ। অর্থাৎ বঙ্কিমের মতে সুখের তিনটি উপাদান আছে—অনুশীলিত বৃত্তিসমূহের স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য এবং পরিতৃপ্তি।[২৭]

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বেন্থাম যিনি আত্মসুখবাদের কথা বলেছেন তিনিও কখনও অপরের সুখের বিষয়টি অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে, নীতিবিদ্যা এবং আইনের উচিত সমাজের মঙ্গলের দিকটি বিবেচনা করা। অন্যদিকে কোঁতের মতে, সামাজিক সমস্যা প্রকৃতপক্ষে নৈতিক সমস্যা। কোঁৎ ছিলেন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী এবং নাস্তিক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দৃষ্টিবাদমূলক সমাজের অস্তিত্ব তখনই সম্ভব যখন সমাজ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সংশোধিত হবে। মানুষের গুরুতর সমস্যা হল যতদূর সম্ভব ব্যক্তিত্বকে

---

[২৬] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৫৮৭

[২৭] ঐ, পৃষ্ঠা-৫৮৮

সামাজিকতার অধস্তন করা; সব কিছুই মনুষ্যত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকা উচিত, ভালবাসা হল সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু এবং মানবতার চূড়ান্ত কাঙ্ক্ষিত বিষয় হল অপরের জন্য বাঁচা।[২৮]

বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের ন্যায় নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু তিনিও মনে করতেন অধিজাগতিক চৈতন্য ধর্ম নয়। ফলস্বরূপ, তিনি হিন্দুধর্মের একটি ইহজাগতিক ভিত্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন—এই প্রচেষ্টার ভিত্তি হল—ঈশ্বরে ভক্তি, সর্বভূতে প্রেম এবং হৃদয়ের প্রশান্তি। উক্ত তিনটি বিষয়ের সম্পূর্ণ উন্নতি ব্যক্তিকে ‘মানুষ’ করে তোলে এবং যা মানুষকে স্থায়ী সুখ প্রদান করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মোক্ষ এবং মোক্ষ লাভের উপায়

ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তি হল একটি অনন্য বা স্বতন্ত্র ধারণা। জড়বাদী চার্বাক ছাড়া প্রায় সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই মোক্ষের ধারণা স্বীকার করে। ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায় মোক্ষ বা মুক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা উল্লেখ করে, যেমন, ‘অপবর্গ’, ‘নির্বাণ’, ‘কৈবল্য’ ইত্যাদি। চতুর্বর্গ পুরুষার্থ অনুযায়ী মুক্তি বা মোক্ষ হল মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় গুলির মধ্যে মোক্ষের স্বরূপ এবং মোক্ষ লাভের মার্গ নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে মোক্ষ ও মোক্ষ লাভের উপায় নিয়ে তাঁর বিদগ্ধ চিন্তা প্রকাশ করেছেন।

---

[২৮] The great, human problem is to subordinate, as far as possible, personality to sociability; everything must be related to humanity, love is the central impulse, to live for others the absolute demand.
Thilly, Frank. *A History Philosophy*. 3rd. Central Book Depot, 1950. p.524

ভারতীয় দর্শনে প্রচলিত মোক্ষ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা গুলিকে মূলত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করা যায়—নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি। কিছু ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় মোক্ষের অবস্থাকে সুখের বা আনন্দের অবস্থা বলে স্বীকার করে না, একেই নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়। আর কিছু দর্শন সম্প্রদায় মোক্ষের অবস্থাকে নিত্য সুখের বা আনন্দের অবস্থা বলে বিবেচনা করে, একে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়ে থাকে। বস্তুবাদী ন্যায় দর্শন সম্প্রদায় অনুযায়ী মোক্ষের অবস্থা হল আত্যান্তিক দুঃখের নিবৃত্তির অবস্থা। নৈয়ায়িকরা যেহেতু বিশুদ্ধ সুখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেহেতু তাঁদের মতে, মোক্ষের অবস্থা নিত্য সুখের অবস্থা হতে পারে না। তাঁরা মনে করেন যে, জগতে এমন কোনও সুখ নেই যা কিনা পরিণামে দুঃখ উৎপন্ন করে না। তাই, নৈয়ায়িকদের মতে মোক্ষের অবস্থা কেবলমাত্র আত্যান্তিক দুঃখের নিবৃত্তির অবস্থা নয়, মোক্ষের অবস্থা হল সুখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদির আত্যান্তিক নিবৃত্তির অবস্থা।

অন্যদিকে মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শনে মোক্ষ সম্পর্কে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। মীমাংসা দর্শন অনুযায়ী আত্মা অপরিহার্য ধর্ম হল সুখ এবং মোক্ষ বলতে বোঝায় আত্মার এই অপরিহার্য ধর্মের উপলব্ধি। সুতরাং, মীমাংসকদের মতে, মোক্ষের অবস্থা হল নিত্য সুখের অবস্থা। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ এই মত স্বীকার করে না। তাদের মতে, যেহেতু সুখ জন্য-ভাবপদার্থ এবং যা কিছু জন্য-ভাবপদার্থ সে সব কিছুই স্বরূপত অনিত্য হয়, সেহেতু নিত্য সুখ বলে কোনও কিছু থাকতে পারে না। যদি মোক্ষের অবস্থাকে সুখের অবস্থা বলা হয়, তাহলে তা মোক্ষের স্বরূপের বিপরীত হবে।

মীমাংসকদের মতন, অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্যও মোক্ষ সম্বন্ধে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, ব্রহ্ম হলেন সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত অভিন্ন। কিন্তু মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে আমরা বুঝতে পারি না যে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। তাই, তাঁর মতে, মোক্ষ হল জীব ও ব্রহ্মের এই অভিন্নতাকে উপলব্ধি করা, অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। শংকরাচার্যের মতে, মোক্ষের অবস্থা হল আনন্দের অবস্থা। আনন্দ ও সুখের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। এটা মনে করা হয় যে, সুখ সর্বদা কোনও না কোনও কারণ থেকে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আনন্দ এরকম কোনও কারণজাত নয়। সুখের অনুভবের ক্ষেত্রে সর্বদা কোনও না কোনও কারণ উপস্থিত থাকে। কিন্তু আনন্দের অনুভবের ক্ষেত্রে এরকম কোনও কারণ উপস্থিত নাও থাকতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রও মীমাংসকদের মতন মোক্ষ সম্পর্কে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে মোক্ষের অবস্থা হল সুখের অবস্থা। তিনি লিখেছেন,

> কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত সে-ই ইহজীবনে সুখী। এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, সুখের উপায় ধর্ম। মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা চিত্তমালিন্যবশত মুক্ত হইতে পারে না।[২৯]

ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ লাভের উপায় হিসাবে তিনটি মার্গের উল্লেখ আছে—জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ। প্রশ্ন হল যে, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি কী এককভাবে মোক্ষ লাভের

---

[২৯] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৩৭

ক্ষেত্রে যথেষ্ট? নাকি কোনও একটি প্রধান মার্গ থাকে এবং অন্যান্য এক বা একাধিক মার্গ সেই প্রধান মার্গের সহায়ক মার্গ হিসেবে উপস্থিত থেকে মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়? না কি মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক মার্গের মধ্যে সমুচ্চয় প্রয়োজন? মীমাংসা ছাড়া, একথা প্রায় সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক স্বীকার করেন যে, কেবলমাত্র কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি ছাড়া মোক্ষ লাভের সহায়ক নয়। অর্থাৎ, কর্ম যেমন এককভাবে মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে না, তেমনি কর্মকে প্রধান মার্গ এবং জ্ঞান ও ভক্তিকে তার সহায়ক মার্গ বলে স্বীকার করে নিলেও তা মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয় না। সুতরাং, কর্ম হয় জ্ঞানমার্গ বা ভক্তিমার্গের সহায়ক হিসেবে মোক্ষের সহায়ক হয়, অথবা এক বা একাধিক মার্গের সঙ্গে যদি কর্মের সমুচ্চয় থাক, তবেই কর্ম মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে কেন ভিন্ন ভিন্ন মার্গের কথা বলা হয়েছে? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে হিন্দুধর্ম অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিই মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ও প্রকৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন মোক্ষমার্গের কথা বলা হয়েছে। সাংসারিক ব্যক্তি মোক্ষ লাভের জন্য কর্ম মার্গ অনুসরণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করে, আর যে জ্ঞানীও নয় এবং কর্ম করতে অপারগ, সে ভক্তি মার্গ অনুসরণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

> সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে সকল সময়ে, সোজা পথে যাইতে পারে না। ...সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ সংসারী, কাহারাও সংসার

> হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে। যে সংসারী, তাহার পক্ষে কর্ম্ম; যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্ন্যাস। যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। ...অতএব সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।[৩০]

জ্ঞানমার্গীদের মতে জ্ঞান এককভাবে মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। এঁদের মতে আত্মা, জগৎ এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে যদি যথার্থ জ্ঞান না থাকে, তাহলে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন সাংখ্য মতে, পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ এবং তাদের মধ্যেকার সম্বন্ধ সম্পর্কে যদি যথার্থ জ্ঞান থাকে, তাহলে কোনও ব্যক্তির পক্ষে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব। নৈয়ায়িকগণও অনুরূপ মত স্বীকার করেন। তাঁদের মতে তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব নয়। শংকরাচার্যের মতে জ্ঞানই হল মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। যদিও সাংখ্য ও নৈয়ায়িকদের সঙ্গে শংকরাচার্যের মতের পার্থক্য আছে। সাংখ্য এবং নৈয়ায়িকগণ মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে জ্ঞানমার্গের প্রাধান্যতা স্বীকার করলেও তারা মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে কর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু শংকরাচার্যের মতে মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে কর্মের কোনও ভূমিকা নেই, কেবলমাত্র জ্ঞানের মাধ্যমেই মোক্ষ লাভ করা সম্ভব।

অন্যদিকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ মনে করেন যে, কেবলমাত্র জ্ঞান মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাঁর মতে সগুণ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না থাকলে মোক্ষ লাভ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বৈদিক ধর্মের মধ্যে এইরূপ ভক্তিবাদের কথা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন

---

[৩০] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*. ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৩৫

পুরাণ ও বৈষ্ণব ধর্মই হল ভক্তিবাদের উৎস। ভগবদ্গীতাতেও আমরা ভক্তিবাদের কথা পাই। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, জ্ঞান এককভাবে মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা মুক্তি বা মোক্ষ, ঈশ্বর এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। কিন্তু কোনও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই কী সেই বিষয়কে পাওয়া যাবে? এমনকি কোনও বিষয়ের প্রতি আমাদের দ্বেষ থাকতে হলে, সেই বিষয়ের জ্ঞান থাকাটাও প্রয়োজন। কিন্তু যে বিষয়ের প্রতি আমাদের দ্বেষ আছে, সেই বিষয়ের জ্ঞান আমাদের থাকলেও, সেই বিষয়কে আমরা পেতে চাই না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যেহেতু তাঁর মতে 'মুক্তি' বলতে বোঝায় নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করা, সেহেতু কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায় না। তিনি মনে করেন যে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থাকলে তবেই ঈশ্বরকে অন্তঃকরণে উপলব্ধি করা যায় এবং ঈশ্বরের প্রতি এই অনুরাগই ভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই কারণেই তিনি বলেছেন যে, যে অবস্থায় মানুষের সমস্ত বৃত্তি ঈশ্বরানুবর্তিনী হয় এবং ঈশ্বরে নিয়োজিত হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র জ্ঞান নয়, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

গীতা-তে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় হিসেবে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমুচ্চয়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, প্রত্যেকটি মার্গেরই গুরুত্ব আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই মত স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন যে, যদিও গীতা-তে মোক্ষ লাভের তিনটি মার্গের ওপর পৃথক পৃথক ভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তবুও পরিশেষে দেখা

যায় যে, ভক্তি হল মোক্ষ লাভের প্রধান মার্গ এবং জ্ঞান ও কর্ম মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে ভক্তির সহায়ক মাত্র। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে *গীতা*-র জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগেরই ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। *গীতা*-র নিষ্কাম কর্মের[৩১] ধারণাটি ব্যাখ্যা করলে আমরা এটা বুঝতে পারব যে, কেন বঙ্কিমচন্দ্র কর্মযোগকে ভক্তিযোগের ভিন্ন ব্যাখ্যা বলেছেন। নিষ্কাম কর্মের ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি উচিত নিষ্কাম চিত্তে অর্থাৎ কোনও উদ্দেশ্য বা আকাংখা ছাড়াই কর্ম করা। কেনোনা, সকাম কর্ম বন্ধনের কারণ। গীতা-তে আরও বলা হয়েছে যে, একমাত্র ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মই নিষ্কাম কর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, মানুষ তখনই ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম করতে পারে, যখন মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলি ঈশ্বরাণুবর্তীনি হয় এবং ঈশ্বরে নিয়োজিত হয়—অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না থাকলে মানুষের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম করা অসম্ভব। সুতরাং, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নিষ্কাম কর্মযোগ প্রকৃতার্থে ভক্তিযোগেরই অন্য নাম। তিনি লিখেছেন,

> যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্খাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ...কর্ম ঈশ্বরে অর্পন করিবে... ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী ও শারীরিক বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে। অতএব কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার [কর্মের] ঐক্য ও সামঞ্জস্য...। এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব, অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কেবল গীতাতেই আছে।[৩২]

---

[৩১] কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণি।। শ্রীমদ্ভগবদ গীতা, ২/৪৭

[৩২] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*. ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬২৯

একইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, জ্ঞানের সঙ্গেও ভক্তির ঐক্য এবং সামঞ্জস্য আছে। *গীতা* অনুসরণ করে তিনি বলেছেন, যিনি সমস্ত রাগ, দ্বেষ, ভয়, ইচ্ছা প্রভৃতি থেকে মুক্ত এবং যাঁর পবিত্র চিত্ত তিনিই একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করতে পারেন।[৩৩] মুক্তির জন্য কী ধরণের জ্ঞান প্রয়োজন? যে জ্ঞানের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ঐক্যকে জানা যায়। এই ধরণের জ্ঞান আহরণের জন্য ভক্তির অনুশাসনে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সম্যক স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং, জ্ঞান তখনই মুক্তির সহায়ক হবে যখন তা ভক্তির দ্বারা অনুশাসিত হবে। তিনি লিখেছেন,

> জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক স্ফূর্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইলে, সেই সঙ্গে অনুশীলনধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌঁছবে। অনুশীলনধর্ম্মেই যেমন কর্মযোগ, অনুশীলনধর্ম্মেই তেমনি জ্ঞানযোগ।[৩৪]

মোক্ষ লাভের উপায় বিষয়ক বঙ্কিমচন্দ্রের মতকে 'সমুচ্চয়বাদ' বলা যায় না বলেই মনে হয়। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে জ্ঞান এবং কর্মের পৃথক কোনও গুরুত্ব স্বীকার করেননি। যেহেতু তিনি মনে করেন যে, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ আসলে ভক্তিযোগেরই নামান্তর, সেহেতু তাঁর এই ব্যাখ্যার মধ্যে নতুনত্ব আছে বলে মনে হয়।

---

[৩৩] বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।। শ্রীমদ্ভগবদ গীতা, ৪/১০

[৩৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব*. যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*. ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা-৬৩০

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সময় ও সমাজকে সামনে রেখে এক নতুন সমাজবোধ ও জীবনাচার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। জীবনের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যেই জীবনবোধকে উপলব্ধি করতে হবে। সেই কারণে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারতন্ত্রী আদর্শ তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তৎকালীন সমাজমনের দ্বারা তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং হিন্দুসমাজ ও ধর্মের অতীত-গৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন।[১] তাঁর প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যে তিনি এক আদর্শ সমাজচিন্তার বীজ রোপণ করেছিলেন। তাঁর মতে সমাজই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি যথার্থভাবে সমাজ গঠন করা যায় তাহলেই একমাত্র ব্যক্তিজীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কারণ সমাজভিন্ন ধর্ম, নৈতিকতা, ব্যক্তির উন্নতি কোনও কিছুই সম্ভব নয়। সুতরাং বঙ্কিমের মতে আদর্শ সমাজ গঠনের ওপরেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তাঁর সমাজচিন্তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন আদর্শের মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এমন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা কর্তব্য যেখানে সকল ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার রক্ষিত হবে। তাঁর এই চিন্তার সাথে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মিল লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করতেন যে ব্যক্তি ও সমাজের উদ্দেশ্য ভিন্ন নয়। তিনি এক সামগ্রিক উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন যেখানে সমাজ ও ব্যক্তির সার্বিক উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হয়—তা হল ঈশ্বরভক্তি।

---

[১] গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন. *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা.* কলকাতা: সুবর্ণরেখা ১৯৯১. পৃষ্ঠা-১৪৬

বঙ্কিমচন্দ্র রুশোকে সাম্যতত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে আদর্শ করেছিলেন। রুশোর মতে, ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এবং অধিকার সমষ্টি অর্থাৎ সমাজের ইচ্ছাধীন। প্রত্যেকের উচিত সমষ্টির ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও নির্দেশ মেনে চলা। তাই, রুশো মনে করেন যে, সমষ্টির প্রতি ব্যক্তির নির্বিচার আনুগত্য শ্রেষ্ঠ সমাজের পরিচায়ক। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও এটা বিশ্বাস করতেন যে সমাজ ব্যক্তির ওপরে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাজকে ভক্তি করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা সমাজ হল শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা এবং রক্ষাকর্তা। সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে যা যা গুণ আছে, সমাজও সেই সমস্ত গুণের অধিকারী। সুতরাং, সমাজ হল ভক্তির পাত্র।[২] এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার সাথে হেগেলের চিন্তাভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের নির্দেশ হল ঈশ্বরের নির্দেশ, সেখানে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও বিচারের কোনও স্থান নেই। জাতীয় ব্যক্তিত্বের সাথে মানুষের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব মিশিয়ে দেওয়া হল মহান কর্তব্য।[৩] অনুরূপভাবে বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন যে, প্রত্যেকের উচিত এমন কর্ম করা যা সমাজের সামগ্রিক উদ্দেশ্যে সাধনের সহযোগী। তাই তাঁর মতে প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্ম যেন সমাজের সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

প্রথমদিকে বঙ্কিমের সমাজচিন্তা পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সাম্যতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দুসমাজ ব্যবস্থায় ঐরূপ পাশ্চাত্য সাম্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কারণ হিন্দুসমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত বর্ণবৈষম্য তার অন্যতম প্রতিবন্ধক। তাই পাশ্চাত্য সাম্যতত্ত্ব থেকে সরে এসে তিনি অন্যভাবে হিন্দুসমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির

[২] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬১৯

[৩] গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন. *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা.* কলকাতা: সুবর্ণরেখা ১৯৯১. পৃষ্ঠা-১৪৮

সমানাধিকারের কথা বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম মতের দ্বারা প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্রও অনায়াসে স্বীকার করেছেন যে, বর্ণ বিভাগ ব্যক্তির গুণ ও কর্ম নির্ভর। মানুষের বর্ণ তার জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। তাই তিনি বলেছেন ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র হলেও, যার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের কোনও গুণ উপস্থিত নেই সে ভক্তির অযোগ্য।[৪] তিনি আরও বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সমানাধিকারের লক্ষণ হল প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের অধিকার থাকা।

তৎকালীন বঙ্গসমাজে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ নিয়ে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, সেই আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে অনেক আপত্তি লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে, বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা ও বহুবিবাহের অপকার সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বগত চেতনা ও উদার মনোভাব ছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি ভিন্নমত পোষণ করতেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে যুক্তিবোধ ও প্রচলিত নীতিবোধের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। যদিও, তিনি মনে করতেন যে, সমাজের সার্বিক উন্নতি সাধন না করতে পারলে, সমাজ সংস্কার সম্ভব নয়। তিনি আরও মনে করতেন যে সমাজের বিশেষ কিছু সমস্যার আইনভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে প্রকৃত সমাজ সংস্কার করা অসম্ভব। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা সমাজ ও ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও উন্নতিকে এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন। তবে একথা সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তায় বঙ্গসমাজের সমস্যা যতটা প্রকাশিত হয়েছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সমস্যা সেখানে অনেকাংশে অনুক্ত থেকে গেছে।

বঙ্কিমচন্দের মতে, সমাজভিন্ন মানুষের ধর্মজীবন থাকতে পারে না। এমনকি, সমাজ ছাড়া মানুষের কোনও মঙ্গলও সম্ভব নয়। তাই তাঁর মতে, সমাজরক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ

---

[৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী,* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬১৮

বিষয়।[৫] এই জন্য তাঁর সমাজচিন্তার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে স্বদেশপ্রীতির কথা। স্বদেশপ্রীতির সূত্র ধরেই তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি মনে করতেন যে, যদি সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করতে হয় তাহলে, আমাদের স্বদেশপ্রীতির অনুশীলন করতে হবে এবং তা সম্ভব হবে যদি আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষ ঘটে। এই কারণে তিনি বলেছেন, 'আত্মরক্ষা অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম'।[৬] কারণ তিনি মনে করেন যে, হিন্দুসমাজের পুনর্জাগরণ জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের উত্থান ভিন্ন সম্ভব নয়। তিনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ একমাত্র ধর্মের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারে। তাই তিনি হিন্দুধর্মের ওপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ভাবনা হিন্দুধর্মভিত্তিক হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে উগ্রহিন্দুত্ববাদ, সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ মুসুলমান বিরোধ ইত্যাদি অভিযোগ তোলা হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে এই সমস্ত আপত্তির উত্থাপন তাঁর ভাবনাচিন্তার অতি সরলীকরণ বলেই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তার ভিত্তিরূপে হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করলেও, এ বিষয়ে তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে, ভারতবর্ষের উন্নতি হিন্দু ও মুসুলমান সমাজের সমান ও যুগপৎ উন্নতির ওপর নির্ভরশীল।

আদর্শ সমাজ গঠনের ওপর জোর দিলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নানা প্রবন্ধ ও উপন্যাসে মানবপ্রকৃতির স্বরূপ ও সম্ভবনা পর্যালোচনা করেছেন এবং কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অনেকেই মনে করেন যে, সমাজের ওপর অধিক গুরুত্ব

---

[৫] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬৬০

[৬] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬৬০

আরোপ করাই বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ব্যক্তির গুরুত্ব হ্রাস করে ফেলেছেন। কিন্তু বঙ্কিমের চিন্তায় সমাজের সাথে সাথে ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নতির প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। কারণ তিনি মনে করতেন যে, আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য ব্যক্তির বিচারবোধ পরিণত ও সুষম হওয়া উচিত। তাই, ব্যক্তিতন্ত্রের পূর্ণ মূল্য দিয়েও তিনি এমন এক সমাজ কল্পনা করেছেন যেখানে ব্যক্তির স্ফুর্তি ও পরিণতি সমাজকে অবলম্বন করেই ঘটবে। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মিলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বলেছেন যে সমাজের অধিকারের পাশাপাশি ব্যক্তিরও অধিকার আছে। সমাজের সম্মিলিত আদর্শ যেমন স্বীকার্য তেমনই ব্যক্তির নিজস্ব বৃত্তির পরিপূর্ণতার দ্বারা লব্ধ বিচারবোধও স্বতঃস্বীকার্য।[৭] সেই কারণে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র গুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ছাপ লক্ষ করা যায়। ব্যক্তির অধিকার প্রসঙ্গে তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকারের কথা স্বীকার করেছেন। নারীর অধিকার বিষয়ক আলোচনায় তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাসের নারী চরিত্র গুলির বিশ্লেষণে তা স্পষ্টতা পায়। তিনি মনে করতেন যে মানুষ আসলে স্বতন্ত্র কিন্তু নিঃসঙ্গ ও সৃষ্টিশীল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সামাজিক জীব হিসাবে ব্যক্তিকে অবশ্যই পরোপকারী এবং পরদুঃখকাতর গুণের অধিকারী হতে হবে। কারণ তিনি মনে করতেন যে, ব্যক্তির স্থায়ী সুখের মূল আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে অন্যের উপকার করার মধ্যেই নিহিত। এই 'অন্য' বলতে তিনি সমাজ ও অন্যান্য ব্যক্তি উভয়কেই বুঝেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার সাথে মিলের ব্যক্তিচিন্তার মিল লক্ষ করা যায়। মিলের উপযোগবাদ অনুযায়ীও ব্যক্তির সেই কর্মই করা উচিত যে কর্ম অধিক মানুষের এবং সমাজের বৃহত্তর কল্যানের সহায়ক।

---

[৭] রহমান, মতিউর এম. *শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র.* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২. পৃষ্ঠা–১৪০

বঙ্কিমের ব্যক্তিচিন্তার একটা দিক হল সামাজিক জীব হিসাবে ব্যক্তির বর্ণনা এবং অন্যটি হল ব্যক্তির 'মনুষ্যত্ব'। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ অপূর্ণ, তাই মানুষকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া। পূর্ণ মনুষ্যত্ব বলতে তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্বিক ও যথার্থ উন্নতি।[৮] এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণাই তাঁর মতে আদর্শ মানবধর্ম। এক্ষেত্রে তিনি দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, প্রথম মানুষের সকল বৃত্তিগুলি ঈশ্বর অনুবর্তী হওয়া প্রয়োজন—তাই ঈশ্বরভক্তি এবং দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরভক্তি ভিন্ন মনুষ্যত্ব নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যে সমাজ ও ব্যক্তির উন্নতিকে একাত্ম করে দেখেছেন তার ভিত্তি হল এই মনুষ্যত্বের ধারণা। মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আদর্শ মানুষের কল্পনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে রাম এবং কৃষ্ণকেই তিনি আদর্শ মানব বলে চিহ্নিত করেছেন। *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থে তিনি তাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনার মাধ্যমে এটাই দেখানর চেষ্টা করেছেন যে আদর্শ মানুষের স্বরূপ কীরূপ হওয়া উচিত। তাঁর বিশ্বাস যে, যদি মানুষ কৃষ্ণকে আদর্শ করে সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ সমুচিত উন্নতি ঘটাতে প্রয়াসী হয়, তাহলে হয় সে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হবে অথবা একাধিক গুণ আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে। বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে কৃষ্ণের চরিত্র চিত্রিত করেছেন তার মধ্যে এক ধরণের নতুনত্ব দেখতে পাওয়া যায়। কারণ ব্যক্তি মানুষ হিসেবে, রক্তমাংসে গড়া মানুষ হিসাবে কৃষ্ণকে কেউ দেখেননি। তবে কৃষ্ণের অবতার গ্রহণের বিষয়ে যে সমস্ত দার্শনিক সমস্যা আছে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চুপ থেকেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা ও ব্যক্তিচিন্তার মূলে আছে ধর্মচিন্তা। সমাজভিন্ন যেমন ধর্মের কোনও মূল্য নেই, তেমনই তাঁর মতে ধর্ম ভিন্ন সমাজের উন্নতি অসম্ভব। তাঁর ধর্মচিন্তা

---

[৮] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী,* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৫৯০

হিন্দুধর্ম কেন্দ্রিক হলেও, নির্দ্বিধায় প্রচলিত অর্থে তিনি হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করেননি। বরং, তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দুধর্মকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই তাঁকে হিন্দুপুনর্জ্জীবনবাদী বলার থেকে হিন্দুসংস্কারবাদী বলাই শ্রেয়। তিনি মনে করতেন হিন্দুধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই কারণেই তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তার ভিত্তিরূপে হিন্দুধর্মকেই গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তিনি গোঁড়া হিন্দু এবং ধর্ম সম্পর্কে একান্ত রক্ষণশীল। কিন্তু ধর্মের যে লক্ষণ তিনি প্রদান করেছেন, সে দিক থেকে দেখলে এই অভিযোগের সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। তাঁর মতে ধর্ম হল যেকোনও বিশ্বাস বা নীতির সমাহার, যা কিনা ব্যক্তির আচরণের ভিত্তি ও নির্ধারক। তিনি নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হলেও, একথা স্বীকার করেননি যে ধর্ম মাত্রই কোনও ধরণের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে বোঝায়। এই প্রসঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ ধর্ম ও পূর্ণ ধর্ম এবং অসম্পূর্ণ ধর্ম ও অপূর্ণ ধর্মের কথা আলোচনা করেছেন। কোনও ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে তাকে তিনি অপূর্ণ ধর্ম বললেও, অসম্পূর্ণ ধর্ম বলেননি। যেহেতু তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের আলোচনা ভিন্ন ধর্মের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান অসম্ভব তাই তিনি মনে করেন যে যে ধর্মে ঈশ্বরবিশ্বাসের স্থান আছে সেই ধর্মই পূর্ণ ধর্ম। কোঁতের ধর্মচিন্তাকে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট বললেও, কোঁতের ধর্মচিন্তার সাথে তাঁর ধর্মচিন্তার পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কোঁতের মতে, ধর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানবতার উপাসনা, কিন্তু বঙ্কিমের মতে ধর্মের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের উপাসনা। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরের উপাসনা ও মানব উপাসনার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম চিন্তার মূল লক্ষ্য হল ঈশ্বরভক্তি এবং এর মূলে আছে তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব। অনুশীলনতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল মানুষ কীভাবে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারে। এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত হল, মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হলে,

প্রয়োজন মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে সেগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ যথার্থ সমুচিত উন্নয়ন ঘটানো এবং সর্বোপরি মানুষের কর্তব্য হল তার বৃত্তি সমূহকে ঈশ্বরমুখী করে তোলা এবং ঈশ্বরভক্তিতে নিয়োজিত করা। এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্মের বিরোধ ও অসঙ্গতিকে দূর করে এক সমন্বিত জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠা করা।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলেছেন যে, 'ধর্ম' শব্দটি নানার্থক, তার মধ্যে একটি অর্থ হল নৈতিকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিকতা বিষয়ক ভাবনাচিন্তার মধ্যেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য বিভিন্ন নৈতিক তত্ত্ব বিশেষ করে উপযোগবাদ এবং ভারতীয় ধর্মনীতির মূল নীতি সমূহকে একত্র করে এক নতুন ধরণের নৈতিক তত্ত্বের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর নৈতিকতা বিষয়ক ভাবনা চিন্তা উপযগবাদী চিন্তার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি উপযোগবাদ তত্ত্বটিকে সমালোচনা করেছেন। যদিও উপযোগিতার নীতিকে তিনি কখনও ভুল নীতি বলে উল্লেখ করেননি। তাঁর মতে উপযোগবাদ হল অনুশীলনতত্ত্বের 'এক কোণের কোণ মাত্র'।[৯] উপযোগবাদের উদ্দেশ্য হল অধিক মানুষের মঙ্গল, কিন্তু বঙ্কিমের দর্শনের ভিত্তি হল 'সর্বজনহিতায়, সর্বজনসুখায়'। তাঁর দর্শনে উপযোগিতার নীতি নৈতিকতার মানদণ্ড হিসাবে স্বীকৃত হয়নি। বরং, তা কেবলমাত্র কোনও পরিস্থিতিতে কোন কর্ম কর্তব্য তা নির্ধারণের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্কিমের মত হল উপযোগিতার নীতির দ্বারা কর্মের নৈতিকতা বিচার করা যায় না, কর্মের নৈতিকতা নির্ধারিত হয় সেই কর্ম ঈশ্বরউদ্দীষ্ট কিনা তার দ্বারা।

---

[৯] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব.* যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী.* ২য় খণ্ড. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা. ১৩৬১. পৃষ্ঠা–৬৫৩

গ্রন্থপঞ্জি

Ahuja, Ram. *Society in India*. New Delhi: Rawat Publication, 2017.

Ambedkar, Dr. B. R. *Annihilation of Caste*. Amritsar: The Ambedkar School of Thought, 1936.

Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Trans. W D Ross. Createspace Independent Pub, 2014.

Aubrey, Edwin Ewart. “The Naturalistic Conception of Man.” *The Journal of Religion* 19.3 (1939): 189-200.

Bagchi, Jasodhara. “Positivism and Nationalism: Womanhood and Crisis in Nationalist Fiction:Bankimchandra's Anandamath.” *Economic and Political Weekly* XX.43 (1985): 58-62.

—. “Representing Nationalism: Ideology of Motherhood in Colonial Bengal.” *Economic and Political Weekly* 20.7 (1990).

Bentham, J. *Principles of Morals and Legislation*. Dover Publication, 1789.

—. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books, 1781 (Reprint 2000).

Bhattacharya, S. "Bankimchandra and the Subjection of Women: Kapalkundala's Destiniy". *Indian Literature*. 31.3 (1988): 161-174

Bhowmik, Jagadindra, Ed. *Rabindranath Tagore in Perspective: A Bunch of Essays*. Calcuuta, 1989.

Broadhead, Robert S. “Notes on the Sociology of Absurd: An Undersocialized Conception of Man.” *The Pacific Sociological Review* 17.1 (1974): 35-45.

Brunner, Karl. “The Perception Of Man And Conception Of Society: Two Approches To Understanding Society.” *Economic Inquiry* XXV (1987): 367-388.

Chatterjee, Bhabatosh, Ed. *Bankimchandra Chatterjee: Essays in Perspective*. Delhi, 1974.

Chattopadhyay, Goutam, Ed. *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century*. Calcutta: Progressive Publishers, 1956.

Clark, T. W. "The Role of Bankim Chandra in the Development of Nationalism." *Historians of India, Pakistan and Ceylon*. Ed. C. H. Philips. London: Oxford University Press, 1967.

Collingwood, R. G. *Religion and Philosophy*. Ed. David Pierce. Istanbul: Mimar Sinam Guzel Sanat University, 2015.

Copleston, F. *A History of Philosophy*. Vol. 6. United Kingdom: Continuum, 1963

Creel, Austin B. *Dharma and Hindu Ethics*. Calcutta: Firma KLM Private Ltd., 1977.

D., Paley D. *Priniciples of Morals and Political Philosphy*. Southern Press, 1973.

Das, Amitabha. *Philosophy of Logic*. Kolkata: Eureka, 2018.

Das, Sisir Kumar. *The Artist in Chains: A Life of Bankim Chandra Chatterjee*. New Delhi: New Statesman Publishing Company, 1984.

Datta, Bhabatosh. *Resurgent Bengal*. Calcutta: Minerva Associates, 2001.

Deshpande, Sharad, Ed. *Philosophy in Colonial India*. Springer India, 2015.

Dey, Dr Sucharita. *Vivekananda and Bankimchandra on Religon*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander, 2004.

Dunman, Jack. "The Marxist and Christian Concept of Man." *Science & Society* 32.3 (1968): 278-287.

Durant, Will. *The Story of Philosophy*. United State: Simon and Schuster, 1926

Durkheim, E. *The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and Its Method*. Translated by W. D. Halls, Steven Lukes, ed. New York: The Free Press, 1982.

Eleonore, Stump. “Acquinas' Metaphysics of Incarnation.” *The IncarnationAn: Interdisciplinary Symposium on the Incarnation of the Son of God*. সম্পাদক and Gerald O'Collins SJ Stephen T. Davis Daniel Kendall SJ. Oxford: Oxford University Press, 2002. 197-220.

Frankena, William K. *Ethics*. New Delhi: Prentice-Hall of India, 1988.

Fujinaga, Jean T. “The Nature Of Man And His Relationship To Society In Rousseau's Emile And Faulkner's "The Bear".” *Educational Theory* 15.3 (1965): 260-264.

Gaenett, Isobel. “Man and Society in Nineteenth-Century Realism: Determinism and Literature by Maurice Larkin.” *New Zeeland Slavonic Journal* 1 (1979): 79-82.

Ganeri, Jonardon. *Ethics and Epics: The Collected Essays of Bimal Krishna Matilal*. Ed. Jonardon Ganeri. Vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Ghosh, A. M. “An Analysis of Manu on Man and Society.” *Journal of Indian Philosophy* 16 (1988): 247-276.

Gupta, Jayanta Kumar Das. *A Critical Study of the Life and Novels of Bankimchandra*. Kolkata: Calcutta University, 1937.

Haldar, M. K. *Renaissance & Reaction In Nineteenth Century Bengal: Bankimchandra Chattopadhyay*. Calcutta: Minerva Associates Pvt. Ltd., 1977.

—. *Foundations of nationalism in India : a study of Bankimchandra Chatterjee*. Delhi: Ajanta Publications, 1989.

Hall, Stuart and Gay. *Question of Cultural Identity*. Sage, 1996.

Harder, Hans, Trans. *Bankim Chandra Chattopadhyay;s Srimadbhagavatgita*. Delhi: Manohar, 2004.

Hick, John. *The Metaphore of God Incarnate*. Louisville, KY: Westminster Press, 1993.

Hollingworth, Harry L. *Psychology and Ethics: A Study of the Sense of Obligation.* New York: Ronald Press, 1949.

Hossain, F. M. Anayet and Md. Korban Ali. “Relation between Individual and Society.” *Open Journal of Social Science* (2014): 130-137. <http://dx.doi.org/10.4236/iss.2014.28019>.

Muir, J. *Original Sanskrit Text on the Origin and History of The People of India*. London: Trubner & Co., 1873.

Kakkori, Leena and Rauno Huttunen. “The Sarte-Heidegger Controversy on Humanism and the Concept of Man in Education.” *Philosophy of Education Society of Australasia* (2010).

Karl Marx, Martin Nicolaus. *Grundrisse: Foundation of the Critique of Political Philosophy*. Penguin Classics, Reprint 1993.

Kaviraj, Sudipta. “Concept of Man in Political Theory: Part One.” *Social Scientist* 8.3 (October, 1979): 15-30.

—. *The Unhappy Consciousness: Bankim Chandra Chattopadhyaya and the Formation of Nationalist Discourse in India*. Delhi: Oxford University Press, 1995.

Kelly, C J. “The God of classical theism and the doctrine of the incarnation.” *Philosophy of Religion* 35 (1994): 1-20.

Kirchheimer, Otto. “Private Man and Society.” *Political Science Quartily* 81.1 (1966): 1-24.

Krishna, Daya, Ed. *Development in Indian Philosophy from Eighteenth Century Onwards*. Delhi: OUP, 1997.

Leftow, Brian. “A Timeless God Incarnate” in eds. Davis, Stephen T.; Kendall, Daniel, SJ; O’Collins, Gerald, S.J. eds. *The Incarnation.* Oxford: Oxford University Press, 1992. pp. 273-299.

Lipner, Juliua J., Trans. *Anandamath*. Oxford: Oxford Univercity Press, 2005.

Lukes, Steven, Ed. *The Rule of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and Its Method*. Trans. W. D. Halls. New York: The Free Press, 1982.

Majumdar, B. B. *History of Indian Social and Political Thought: From Rammohon to Dayanand*. Calcutta: Firma KL Mukhopadhyay, 1967.

Majumdar, Ujjal Kumar, Ed. *Bankim Chandra Chattopadhyay: His Contribution to Indian Life and Culture*. Kolkata: The Asiatic Society, May, 2000.

Mansel, H. J. *Metaphysics or the Philosophy of Consciousness*. Edinburgh: A and C Black, 1860.

Matilal, B. K. *The Character of Logic in India*. State University of New York Press, 1998.

Mill, John Stuart. *On Liberty and Other Essays*. World Classics, 1991.

—. *Utiliterianism*. London: Parker, Son and Bourn, West Strand, 1863.

Morris, V. Thomas. *Our Idea of God*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1991.

—. *The Logic of God Incarnate. Ithaca*. New York: Cornell University Press, 1986.

Mukherjee, S. N. *Bankim chandra Chatterjee: Sociological Essays*. Calcutta: Rdhi India, 1986.

O'Donnell, Mike. *Sociology*. United Kingdom: Thomas Nelson & Sons, 1997.

Petzall, Ake. "Man and Society." *Lund* (1950).

Podder, Aurobindo. *Bankimmanas, Bamkim Oitihya O Bandemataram*. Kolkata: Uccharaon, 2012.

Radhakrishnan, S. *Religion and Society*. Harper Collins Publishers India Pvt. Ltd, 1997 (1st Published 1947).

Ray, Apratim, Trans. *Dharmatattwa*. New Delhi: Oxford University Press, 2003.

Ray, Dr. Anil Baran. "Bankimchandra: Development of Nationalism and Indian Identity." *Prabudha Bharata* 110.8 (August 2005): 418-426.

Rosenow, Eliyahu. “Bourgeous or Citoyen? The Democratic Concept of Man.” *Educational Philosophy and Theory* 24 (1992): 44-50.

Roychowdhury, Tapan. *Europe Reconsidered: Perceptions of West in Nineteenth Century Bengal*. New Delhi: OUP, 1988.

Runciman, W. G., Ed. *Weber Selection in Translation*. New York: Cambridg University Press, 2007.

Sarkar, Tanika. “Imagining a Hindu Nation: Hindu and Muslim in Bankimchandra's Later Writings.” *Economic and Political Weekly* 29.39 (1994): 2553-2561.

Sarkar, Tanika. “Imagining Hindu Rastra: The Hindu and Muslim in Bankim Chandra's Writtings.” *Making India Hindu*. Ed. David Ludden. New Delhi: Oxford University Press, 1996.

Sen, Amiya P. *Hindu Revivalism in Bengal*. Delhi: OUP, 1993.

Sen-Gupta, Nares Chandra. *The Abbey of Bliss: A Translation of Bankimchandra Chatterjee's Anandamath*. Kolkata: Padmini Mohon Niyogi, 1906.

Sidgwick, H. *Methods of Ethics*. United Kingdom: Macmillan & Co., 1874.

Sil, Narasingh P. “Bande Mataram: Bankimchandra Chattopadhyay's nationalistic thought revisted.” *South Asia: Journal of South Asian Studies* 25.1 (2007): 121-142.

Smith, Huston. *The Religion of Man*. New York: Harper and Row Publisher, 1965.

Spencer, Herbert. *The Study of Sociology*. London: Henry S. King & Co, 1873.

Stateman, Daniel, Ed. *Virtue Ethics*. Edinburgh University Press, 1997.

Stump, E. "Acquinas' Metaphysics of Incarnation". In D. K. Stephen T. Davis Ed., *The Incarnation: An Interdisciplinary Symposium on the Incarnation of the Son of God*. pp. 197-220. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Tagore, Rabindranath. *The Religion of Man*. London: George Allen and Unwin Ltd, 1931.

Thilly, Frank. *A History Philosophy*. 3rd. Central Book Depot, 1950.

Tillich, Paul. "The Concept of Man in Existential Philosophy." *The Journal of Religion* 19.3 (July, 1939): 201-215.

Tripathi, Amalesh. *The Extremist Challenge*. Calcutta: Orient Longman, 1967.

Weber, Max. *The Religion of India - The Sociology of Hinduism and Buddhism*. Hans H. Gerth and Don Martindale Ed. and Trans. Illinois: The Free Press: 1958.

Weber, M. The Nature of Social Action. In W. Runciman Ed. & E. Matthews Trans., *Max Weber: Selections in Translation*. Cambridge: Cambridge University Press. 1978. pp. 7-32

করীম, রেজাউল. *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসুলমান সমাজ.* কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল, জানুয়ারি, ২০১৪.

কুণ্ডু, অশোক. *বঙ্কিম-অভিধান.* কলিকাতা: ভারতী বুক স্টল, ১৯৬৯.

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন. *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা.* কলকাতা: সুবর্ণরেখা ১৯৯১.

ঘোষ, হেমেন্দ্র প্রসাদ. *বঙ্কিমচন্দ্র.* কলিকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৮৮৪.

চক্রবর্তী, শিবেন্দু শেখর, সম্পা. *আত্মবিকাশ.* কলকাতা, ২০১২.

চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল. *বঙ্কিমের স্বপ্ন.* কলিকাতা: নবজীবন সংঘ, ১৩৪৪.

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচীশচন্দ্র. *স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত.* কলিকাতা: Universal Library, ১৩১৮.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. “"কৃষ্ণচরিত্র" সমালোচনা.” *আধুনিক সাহিত্য.* কোন তারিক নেই.

—. *ব্যক্তিত্ব.* অনুবাদক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর. নদিয়া: লোক সেবা শিবির, ২০১১.

তেওয়ারি, রামবহাল. *বঙ্কিম বীক্ষা.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩.

দত্ত, ভবতোষ. *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র.* কলকাতা, ১৯৬১.

—. সম্পা. *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত রচনা.* কলকাতা: সাহিত্য অকাডেমি, ২০১৩.

দত্ত, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র.* কলকাতা, ১৯৫১.

পোদ্দার, অরবিন্দ. *বঙ্কিম মানস.* কলিকাতা: ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, ১৩৫৮.

বঙ্কিম-সাহিত্যের-ভূমিকা. কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬০.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস. *বঙ্কিমচন্দ্র.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৯.

বসু, রাজনারায়ণ. *সেকাল ও একাল.* কলকাতা, ১৭৯৬.

বসু, শ্রীলেখা. *বঙ্কিম-চর্চা.* কলকাতা: গ্রন্থমিত্র, ২০০৮.

বাগল, যোগেশ চন্দ্র, সম্পা. *বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬০.

—. সম্পা. *বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড.* সম্পাদক যোগেশ চন্দ্র বাগল. কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬১.

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন. *প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র.* কলকাতা: প্রতিভাস, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১৪.

—. *বঙ্কিম সৃষ্টি সমীক্ষা.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১১.

—. *বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন.* কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৩৬৬.

—. *বঙ্কিমচন্দ্র তিন শতকের চোখে.* কলকাতা: প্রতিভাস, জানুয়ারি, ২০১৫.

—. *বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী.* কলকাতা: আনন্দ, ২০১২.

—. *রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম.* কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস, ১৩৬৭.

মজুমদার, মোহিতলাল. *বঙ্কিম-বরণ.* হাওড়া: বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬.

মিত্র, হরপ্রসাদ. *বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ.* কলিকাতা: বি. সারকার এন্ড কোং, ১৩৭০.

মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ, সম্পা. *বঙ্কিম-পরিচয়.* কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮.

রহমান, মতিউর এম. সম্পা. *শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র.* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২.

রায়, শ্রীগোপালচন্দ্র. *বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ.* কলিকাতা: সাহিত্য সদন, ১৩৬৭.

রায়চৌধুরী, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন. *বঙ্কিমচন্দ্র (কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর).* কলিকাতা: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ১২৯৩.

শাস্ত্রী, শিবনাথ. *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ.* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০০৯.

সমাজদৃষ্টি, উপন্যাসে. *জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩.

সমাজপতি, সুরেশকুমার, সম্পা. *বঙ্কিম-প্রসঙ্গ.* ১৯৮২.

সিংহ, শ্রীবিমলচন্দ্র. *বঙ্কিম-প্রতিভা.* কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস, ১৩৪৫.

সেনগুপ্ত, শ্রীসুবধচন্দ্র. *বঙ্কিমচন্দ্র.* কলিকাতা: এস, সি সরকার এন্ড সনস লিমিটেড, ১৩৪৫.

হক, আবুল কাসেম ফজলুল এবং মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *মানুষের স্বরূপ.* ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৩.

এছাড়াও

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা." ১৮৪৩-১৯৩১.

"নবজীবন পত্রিকা." ১৮৮৪-১৮৮৮.

"প্রচার পত্রিকা." ১৮৮৪-১৮৮৮.

"বঙ্গদর্শন পত্রিকা." ১৮৭২-১৮৯১.

Signature of the Candidate